Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে ইলম চর্চার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রাজিদুল ইসলাম

রোলঃ 228011906

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বর্তমান সময়ে ইলম চর্চার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রাজিদুল ইসলাম
রোলঃ 228011906

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বর্তমান সময়ে ইলম চর্চার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: রাজিদুল ইসলাম, আইডিঃ 228011906 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বর্তমান সময়ে ইলম চর্চার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

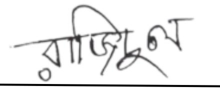

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

মো: রাজিদুল ইসলাম

আইডিঃ 228011906

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকাঃ 7

ইলমের পরিচয়: 8

ইকরা اقرأ পড়, ... 8

ফরজ ইলম 10

ফরজে কিফায়া ইলম 11

কেন ফরযে কিফায়া ইলম শেখা গুরুত্বপূর্ণ? 12

ইলম কি চাই? 13

ইলমের ফজিলত 13

দীনি জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতি 18

ইন্টারনেট বা অনলাইন থেকে ইলম অর্জনে সতর্কতা 19

ইলম অর্জনে শিক্ষক নির্বাচন এর গুরুত্ব 20

যৌবন ও জ্ঞানার্জন 21

"ইলম" আকিদা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে 23

কিয়ামতের আলামত 32

হাদীস থেকে শিক্ষণীয়ঃ 34

বর্তমান সময়ে ইলম অর্জন এর প্রতিবন্ধক 34

ইলম অর্জনে মুজাহাদা ও সবর 35

হতাশা ও হীনমন্যতা দূর করার গুরুত্ব 41

ইলম অর্জন না করার ক্ষতি 42

ইলম অনুযায়ী আমল না করার ক্ষতি 43

ইলমের সাথে ইলমের আদব শিক্ষা করা অপরিহার্য 45

বর্তমানে যেসব জিনিসে ইলমের একাগ্রতা নষ্ট হয় 48

কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরি (বুখারি) 50

পড়তে ইচ্ছে করে না- এ রোগের চিকিৎসা..53

কিতাব বুঝি না- এ রোগের চিকিৎসা..53

বর্তমান সময়েও মুসা (আ:) এর মত ইলমের পিপাসা থাকা: 54

ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমল বিন মা'রুফ ও নাহিয়ানিল মুনকার তথা দাওয়াত ও তাবলীগ..56

প্রতিটি আমল এর প্রতি গুরুতারপ করা..59

কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমামঃ...59

প্রতিটা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ..60

ভুমিকাঃ

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون অর্থাৎ, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি এক সমান? আলেমের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء
রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,طلب العلم فريضة عل كل مسلم
আর আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, فضل العالم عل العابد كفضلى عل ادناكم
আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য।
যেমন আমরা কুরআনুল কারীমে সুরা মুলকে বলেন, الَّذِىۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَالۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا‌ ؕ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ
যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল।—(আল মুল্‌ক - ২)
তাই তিনি যুগ যুগ ধরে তার ওহীর আলোকে যুগে যুগে রাসুল নবী পাঠিয়েছেন। যেন মানুষ অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোতে ফিরে আসেন।

পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এবং কেয়ামত অবধি ইলমে ওহির গুরুত্বপূর্ণ অপরসীম।কেননা, ইলমে ওহি ছাড়া মানুষ হেদায়েত লাভ করতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর যুগে তৎকালীন মক্কাবাসীদের মধ্যে অজ্ঞতা নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা তে মানুষ নিপতিত ছিল। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভাবের পর তাদের কে ওহীর আলোকে ইসলাহ করতে থাকেন। যার ফলে হাজার বছর পরেও এই যুগ পর্যন্ত আমরা ইসলামকে পেয়েছি, নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে পারছি।
বর্তমানে পৃথিবীতে পূর্বে যুগের থেকে মানুষের সংখ্যা বহুগুণ। তবে প্রকৃত মুসলিম মমিন নেককার বান্দা পাওয়া সংখ্যাটা অনেক কম। ইলমের গুরুত্ব পূর্বেও যেমন ছিল বর্তমানেও তেমন আছে, তবে বর্তমানে শিরক,কুফর ও বিদয়াত এর এত ছড়াছড়ি যে সঠিক ইসলাম খুঁজে বের করা এবং পালন করা অনেক দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে।

এসব পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায় আমাদের ইলমে ওহিকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে এর প্রচার প্রসার দাওয়া সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।
বর্তমান সময়ে আমাদের ইলমের গুরুত্ব বুঝে ইলম হাসিল করার চেষ্টা করতে হবে অনবরত। তাহলে ইনশাআল্লাহ কেয়ামত অবধি কুরআন সুন্নাহ এর জ্ঞান বইতে থাকবে অনবরত।
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সারা পৃথিবীর মানুষকে কুরআন সুন্নাহ কে আঁকড়ে ধরার তাওফিক দান করুক আমিন।

ইলমের পরিচয়:

শাব্দিক অর্থ: 'ইল্ম (জ্ঞান) হচ্ছে জাহল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। আর 'ইল্ম এর অর্থ হলো: “কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানতে পারা”। পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু বিদ্বান বলেছেন, 'ইল্ম হলো (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত”। অন্যান্য আলিম বলেছেন, “নিশ্চয় 'ইল্ম (কোন কিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট”। আর এখানে 'ইল্ম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো 'ইল্মে শারঈ (ইসলামী জ্ঞান)। আর 'ইল্মে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: "আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর 'ইল্ম (জ্ঞান)।”(কিতাবুল ইলম - মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আল উছাইমিন)

ইকরা اقرأ পড়,

ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। তাই প্রতিটি মুসলিমকে সে কারনে আনুগত্য করবে, কী ভাবে আনুগত্য করবে এবং কি কি কাজ থেকে বিরত থাকবে তা জানার জন্যে ইলম বা জ্ঞানের প্রয়োজন। এ জন্যেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবুওয়াতের সূচনাতেই সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো হেরা গুহায় নাযিল করেন তাতে ইলম-এর গুরুত্ব প্রকাশ পায়। আয়াতগুলো হচ্ছেঃ

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمَ يَعْلَمُ

(সুরা আলাক,৯৬ঃ১-৫)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে:

ক. মহান স্রষ্টার প্রথম নির্দেশ হচ্ছে اقرأ পড়।
খ. 'জমাট রক্তের' মত সাধারণ ও তুচ্ছ বস্তু থেকে 'মহিমান্বিত প্রতিপালক'-এর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে জ্ঞানসাধনাকে সেতুবন্ধন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে
গ.কলম-এর সাহায্যে তিনি মানব জাতিকে জ্ঞানদান করেছেন।

এই প্রথম প্রত্যাদেশ থেকেই ইল্মের ফযীলত সুস্পষ্ট।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

قُلۡ ہَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (সুরা যুমার, ৩৯:৯)

یَرۡفَعِ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ ۙ وَالَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সুরা মুজাদালা, ৫৮:১১)

ইলমের উৎস ওহিভিত্তিক, কেননা আল্লাহ সুবহানাতায়ালা এ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর থেকে পৃথিবীতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেককে ওহীর মারফতে পরিচালনা করেছেন।
তাই সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-এর জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

و عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা বাকারা, ২: ৩৯)

বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে অনেক ধরনের জ্ঞানের চর্চা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা কি সব জ্ঞান আয় তো করব বা শিখতে পারবো?

না, একজন মুমিন ব্যক্তি সে প্রথমত ওহীর জ্ঞান আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে যার ফলে তার আখিরাত এবং দুনিয়াতে কামিয়াবী লাভ হবে।

হ্যাঁ আমাদের দুনিয়াবী অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।তবে দুনিয়াতে আমি কোন বিষয়ে রিজিক অন্বেষণের জন্য কাজ করতে চাই, সে বিষয়ে পারদর্শিতা হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করলেই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। সেটি এখানে মুখ্য।

বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ। দ্বিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন অনেক প্লাটফর্ম পূর্ব যুগের থেকে সহজ হয়ে গেছে। তেমনি দুনিয়াবি জ্ঞান অর্জন করার জন্য অনেক মাধ্যম তৈরি হয়ে গেছে। তাই আমাদের সচেতন হয়ে ইলমে ওহীর জ্ঞান যেখানে আমরা সঠিকটা পাবো সেখান থেকেই দিনে জ্ঞান অর্জন করতে হবে অন্যথায় আমাদের জন্য যুগের কিছু ফিতনা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ থাকবে আমরা কি পড়তে হবে।এটাই ইলমে ওহীর দাবি। কেননা আমলের পূর্বে জ্ঞান প্রয়োজন। আর জ্ঞান বিহীন আমল কখনোই সম্ভব না।

প্রতিটি যুগেই, তার নিজস্ব চাহিদা গতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আমাদেরকে সেভাবেই যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইলমে ওহির জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন আমীন।

ফরজ ইলম

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -(মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)
আবশ্যক পরিমাণ ইল্ম হাছেল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ।

আবশ্যক পরিমাণ ইলল্ম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেন-দেন ও কাজ-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়া।(যদি জীবন গড়তে যান - মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন উদ্দিন)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে।

এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফরজে কিফায়া ইলম

"ফরযে কিফায়া" বলতে বোঝায়—কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজ, যা সমাজের কিছু সংখ্যক লোক সম্পাদন করলে বাকিদের দায়মুক্তি হয়, কিন্তু কেউই যদি তা না করে, তাহলে সবাই গোনাহগার হয়।
এই কাজগুলোর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা শেখার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ইলম থাকা দরকার। এই ইলমই হলো ফরযে কিফায়া ইলম।

ফরযে কিফায়া ইলমের উদাহরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র:

১. ইলমে শরিয়াহ (দ্বীনী জ্ঞান):

ফিকহ (ইসলামী আইন)

তাফসির (কুরআনের ব্যাখ্যা)

হাদীস

উসূলুল ফিকহ

ক্বাযা/বিচারনীতি

ইলমুল কালাম (আকীদাহ রক্ষা)
তাজবীদ ও কিরাআত

২. ইসলামী বিচার ও ফতোয়া প্রদানের জন্য:

ক্বাযী, মুফতী, মুজতাহিদ, এবং শারঈ বিচারক তৈরির জন্য এই ইলম ফরযে কিফায়া।

কারণ সমাজে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য এদের থাকা আবশ্যক।

৩. ইলমে কিফায়ার অন্তর্গত পার্থিব ইলম (যদি তা দ্বীনের খিদমতে লাগে):

চিকিৎসাশাস্ত্র (যদি উম্মাহর প্রয়োজনে হয়)

প্রকৌশল, গণিত, প্রযুক্তি ইত্যাদি (যদি মুসলিম সমাজের স্বনির্ভরতা ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়)

যেমন, মুসলিম সমাজে একজন বা একাধিক মুসলিম চিকিৎসক থাকাটা ফরযে কিফায়া, যাতে সবাই চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

কেন ফরযে কিফায়া ইলম শেখা গুরুত্বপূর্ণ?

যাতে সমাজে দ্বীনের প্রচার, রক্ষণ ও বিচারব্যবস্থা টিকে থাকে।

মানুষ বিভ্রান্তি ও বিদআত থেকে বাঁচতে পারে।

ধর্মীয় প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়।

উদাহরণ:

১. একজন হাফিজ বা মুফতি হওয়া ফরযে কিফায়া।

পুরো সমাজ না হয়ে কিছু লোক হাফিজ বা মুফতি হলে বাকিরা দায়মুক্ত।

২. কোনো শহরে একজনও আলেম না থাকলে:

সবাই গোনাহগার হবে, কারণ দ্বীনি প্রশ্নের উত্তর দানকারী কেউ নেই।

ফরযে কিফায়া ইলম হলো এমন ইলম যা মুসলিম সমাজে কিছু মানুষের শেখা আবশ্যক, যাতে পুরো সমাজের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনে দ্বীনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ইলম কি চাই?

ইলম হল নূর। ইলম চাই ব্যক্তি সহীহ নিয়তে ইলম হাছিল করবে - আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে, আমলের নিয়তে, দ্বীন ও শরীয়তের পুনর্জীবনের নিয়তে। অন্তর আলোকিত করার, বাতেনকে সুশজ্জিত করার এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে ইলম হাসিল করার।

ইলমের ফজিলত

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" .

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।-(ইবনে মাজা হাদিস ২২০)

হাদিসে আরও ইরশাদ হয়েছে,

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মুসলমান (নর ও নারী) এর উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

ইলমের ফজিলত অনেক বেশি। নিচে আরও কোরআন এবং হাদিস থেকে আমরা দলিল পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

﴿يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ﴾

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। (আল মুজাদালাহ্ - ১১)

কত উঁচু করে দেন আল্লাহ সেটা বলেননি। হতে পারে তাদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনাও আসবেনা,তাই সিমানা নির্ধারণ না করেই বলা হয়েছে, অনেক উঁচু করে দেন।এই মর্যাদা উঁচু করা হবে শুধু আখেরাতেই তাও নয়, দুনিয়াতেও আলেমদের মর্যাদা উঁচু করা হবে।(বইঃ যদি জীবন গরতে চান)

নফল ইবাদত এর চেয়ে ইলম শিক্ষা করার ফজিলত বেশি। এক হাদিসে আছে,
হযরত সায়াদ

عَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعِ) .رواه الحاكم(

অর্থাৎ, হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত বেশি প্রিয়। আর তোমাদের দ্বীনী বিষয়ের মধ্যে পরহেযগারী একটি উত্তম বিষয়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

ইল্মের ফযীলত বেশি হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয় যে, যাকে ইল্ম দান করা হয় সে বেশি ফযীলতের অধিকারী, আল্লাহ তাকে বেশি ফযীলত তথা বেশি কল্যাণ দান করেছেন।

অন্য এক হাদীছে এ কথাই ইরশাদ হয়েছে

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَض خَطِيبًا يَقُولُ : سَمِعْتُ,
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي
الدين الحديث) .رواه البخاري في كتاب العلم - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন যে, আমি **রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি-** আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। (বোখারী)

ইলমের ফজিলত বায়ান করে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** যখনই কোনো একটি দল আল্লাহ্ ঘরসমূহের কোনো এক ঘরে (মসজিদে বা মাদ্রাসায়) একত্র হয়ে পাঠ আল্লাহর কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পরে তার আলোচনা করতে থাকে, তখনই (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে) তাদের উপর 'ছাকীনা' তথা স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়,

ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যারা রয়েছে তাদের নিকট (অর্থাৎ, ফেরেশতাদের নিকট) তাদের উল্লেখ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "ছাকীনা" অর্থ কারও কারও মতে এক ধরনের খাছ রহমত, যার দ্বারা অন্তরে শান্তি পয়দা হয়। স্থিরতা, গাম্ভীর্য, ফেরেশতা ইত্যাদি অর্থও কেউ কেউ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখিত সব কয়টিকে সমষ্টিগত অর্থে এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, উল্লেখিত সব কয়টি ফেরেশতাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বর্ণনা করেন যে, একদিন **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম** তার মসজিদে (অর্থাৎ,মসজিদে নববীতে সাহাবীদের) দুটো মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন।(তন্মধ্যে একটি মজলিস ছিল দুয়ার, আর একটি ছিল ইলমের।) তখন সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এরশাদ করলেন, উভয় মজলিসি ভালো কাজে আছে; তবে একটি মজলিস অপরটি থেকে উত্তম। এই যে দলটি (যারা দোয়ায় মশগুল আছে) তারা আল্লাহকে ডাকছে, আল্লাহর প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের আশা পূর্ণ করতে পারেন আবার ইচ্ছে হলে নাও করতে পারেন। কিন্তু এইযে (অপর) দলটি যারা ফেকাহ বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইলম শিক্ষা করছে এবং অজ্ঞ লোককে শিক্ষা দিচ্ছে এরা উত্তম। আর আমিও মুয়াল্লিম বা শিক্ষা দাতা হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অনন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। (সুনানে দারিমি)

ইলমের ফজিলত বয়ান করে অন্য এক হাদিসে বরনিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍ رَض قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرّ! لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ آيَةً مِّنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ مِنْ تَغْتَبَعًا، وَلَأَنْ تَغْتَبَعًا الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تُصَلِّيَ
أَلْفَ رَكْعَةٍ।

) رواه ابن ماجة في المقدمة – باب فضل من تعلم القرآن وعلمه(

المنذري : إسناده حسن। (

অর্থাৎ, হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকাল বেলা গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর তাহলে তা তোমার জন্য একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও উত্তম। আর যদি সকাল বেলায় গিয়ে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, -চাই তার উপর আমল করা হোক বা না

হোক- তাহলে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত নফল নামায থেকেও উত্তম। (ইবনে মাজা)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

হযরত সাফওয়ান ইবনে আছছাল (রা.) **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,** তালিবে ইল্মের ইল্ম সন্ধানের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের পর বিছিয়ে দেয়া দ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ তাদের ইল্ম শিক্ষা করার মজলিসে হাজির হন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন। অথবা প্রকৃতই ফেরেশতাগণ তাদের সম্মানার্থে পর বিছিয়ে দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে **রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,**

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

ورواه أبو داود عن أبي الدرداء في أول كتاب العلم ٣٦٣٨ واللفظ لمسلم)(

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইলল্ম সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীছের শেষাংষে

এসেছে- وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ

أبو داود في أول كتاب العلم ۳٦۳۸)(   )

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এবং পানির গর্ভের মাছ (পর্যন্ত) আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (আবু দাউদ)

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফজিলত বয়ান করে উপরোক্ত হাদিসের একাংশে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ইরশাদ করেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ

لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَاوَرَّثُوا فَمْ الْمًا، وَرَّثُوا أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ।

داود في أول كتاب العلم ٣٦٣٨)((

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দেরহাম-দীনারের উত্তরাধিকার রেখে যান না, তাঁরা ইল্মের উত্তরাধিকার রেখে যান। অতএব যে ইল্ম (-এর হিস্সা) গ্রহণ করল সে (নবীর উত্তরাধিকার গ্রহণ করল বিধায়) একটা গুরুত্বপূর্ণ হিস্সা গ্রহণ করল। (আবূ দাউদ)

আল্লাহতালা তার কালামে পাকে বলেন,

{ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ}

অর্থাৎ বল, যারা জানে আর যারা জানে না উভয়ে কি সমান? (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে।(আয্-যুমার - ৯)
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল,জ্ঞানী এবং মূর্খ পার্থক্য হচ্ছে ইলমে ওহি।

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- তা- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।-(তারীখে তাবারী ৬/৫৭২ মাসিক আলকাউসার - মাউলানা আব্দুল্লহা বিন রুহুল আমিন)
হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا» . رَوَاهُ مُسلم

স্বর্ণ রৌপ্যের খনিসমূহের ন্যায় মানব জাতিও (নানা গোত্র ও কবিলার) খনিসমূহ। তাদের মধ্যে যারা (যে গোত্র) অন্ধকার যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যখন দ্বীনের গভীর জ্ঞান লাভ করবে। -(মুসলিম)

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -(মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।-(মাসিক আলকাউসার-মাউলানা আব্দুল্লহা বিন রুহুল আমিন)

দীনি জ্ঞান অর্জনের সঠিক পদ্ধতি

ইদানিং কালে দ্বীন মানতে আগ্রহী অনেক ভাইয়েরা ইসলামের বিধানাবলি জানতে ইন্টারনেটের আশ্রয় নিচ্ছেন। ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু যে কোন ধরনের জ্ঞান আহরণের জন্য জ্ঞানার্জনের সঠিক মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ অতি আবশ্যিক বিষয়।

জ্ঞানার্জনের সঠিক ও প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে শেখা ও শেখানো। শিক্ষক শেখাবেন। ছাত্র শিখবে। শিক্ষকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জ্ঞানার্জন করাই জ্ঞানার্জনের মৌলিক পদ্ধতি। আমাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আজ অবধি জ্ঞানার্জনের এই ধারা চলমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে কিছু বাক্য শেখানোর মাধ্যমেই মানবেতিহাসে জ্ঞানার্জনের সূচনা হয়।

এভাবেই প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) তাদের শিষ্যদের এভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণকে (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) এভাবেই দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের যে বিকাশ হয় তা তুলনামূলক শুদ্ধ ও হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে। অন্যান্য সিস্টেমে জ্ঞানের এমন বিকাশ ও শুদ্ধতা অর্জিত হয় না।

ইন্টারনেট বা অনলাইন থেকে ইলম অর্জনে সতর্কতা

ইন্টারনেট বা অনলাইন মাধ্যমে ইলম অর্জনের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে, যেগুলো জানা ও মানা খুব জরুরি। ইলম শরঈ (দ্বীনি জ্ঞান) একটি পবিত্র আমানত, যার জন্য সঠিক উৎস, নির্ভরযোগ্য উস্তাদ এবং সত্য নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক। নিচে ইন্টারনেট থেকে ইলম গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা তুলে ধরা হলো:

১.রেনডমলি যেকোনো জায়গা থেকে পড়াশোনা না করা।
২.বিশ্বস্ত কোন youtube চ্যানেল বা লিংক ব্যবহার করা।
৩.অনলাইনে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় কোন কিছু ব্যতীত এলোপাথাড়ি এখানে সেখানে ব্রাউজ করা থেকে বিরত থাকা।
৪.নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা, যাতে করে কোন গুনাহে জড়িত না হয়ে যাই।
৫.যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কোন একজন আলেমের সাথে যোগাযোগ রাখা
৬.অনলাইনে কোন বই পাড়ার পূর্বে লেখক এর মানহাজ, পড়াশোনা, আকিদার বিশ্বাস (অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) আমল এখলাসে ঠিক থাকা এবং সেই লেখক বা আলেমর বিষয়ে সমসাময়িক যুগের আলেমদের স্বীকৃতি থাকা।
৭.সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা, যাতে করে মূল শিক্ষার সময় গুলো এবং অন্যান্য জরুরী কাজগুলো যাতে অনলাইনের কারণে ব্যাহত না হয়।
৮.পরিশেষে,যেহেতু অনলাইন বা ইন্টারনেট থেকে ইলম অর্জন করায় বিভিন্ন ফিতনার আশংকা থাকে তাই আল্লাহ তাআলার কাছে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিয়মিত দোয়া করা।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলম এবং আমলে বারাকা দান করুন আমিন।

ইলম অর্জনে শিক্ষক নির্বাচন এর গুরুত্ব

জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষক নির্বাচন। যার হাত ধরে আপনি জ্ঞানের অথৈ সমুদ্রে যাত্রা করবেন তার জ্ঞান যদি ভুল বা অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে আপনি মাঝ পথে ডুবে যাবেন। তাই শিক্ষক নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। বিশিষ্ট তাবিঈ মুহাম্মাদ বিন সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই এই ইলম দ্বীনের আওতাভুক্ত। অতএব তোমরা কার কাছ থেকে জ্ঞান আহরন করছ, তার সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নাও।

(শামায়িলুত তিরমিযী, হাদিস নং ৪১৭, ইমাম তিরমিযী-মৃত্যু ২৭৯হিজরী রাহিমাহুল্লাহ রচিত।)

একজন ছাত্র সাধারণত তার শিক্ষককে আইডল হিসেবে গ্রহণ করে। তার পথ ও মতকে অবচেতন মনেই আকড়ে ধরে। এবং সে অনুযায়ীই তার জীবন পরিচালনা করে। এজন্যই আপনি যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শে আদর্শবান কোন শিক্ষকের শীষ্যত্ব লাভ করেন, তাহলে আপনি দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। পক্ষান্তরে আপনার শিক্ষক যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে আপনি খুব সহজেই ভ্রান্তির শিকার হবেন। ভুল ও বিভ্রান্ত শিক্ষা আসন গেড়ে বসবে আপনার মন মগজে। তাই যেনতেন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করবেন না। এতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মুহাম্মাদ বিন সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু যখন ফিতনার (খাওয়ারিজদের আত্মপ্রকাশ) দুয়ার খোলে গেল তাঁরা সনদ জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। তাঁরা বলতেন, তোমরা বর্ণনাকারীর নাম বলো। যদি দেখা যেত বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে হাদিস গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বহির্ভূত কোন বিদআতি হলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন তার বর্ণনা।

(মুকাদ্দিমাতু মুসলিম সূত্রে লামাহাতুম মিন তারীখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদিস, পৃষ্ঠা নং ৭৩, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ-মৃত্যু ১৪১৭হিজরী- রাহিমাহুল্লাহ রচিত।)

যৌবন ও জ্ঞানার্জন

যৌবন মূলত জ্ঞানার্জনের সময়। ইমাম বায়হাকী রচিত আল-মাদখাল নামক কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে **রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,**

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَبِيْبَتِهِ إِخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ. البيهقي في

المدخل كذا في المقاصد الحسنة(

অর্থাৎ, যৌবনে যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। (আল-মাদখাল)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالٍ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهُوَ شَابِرَةَ كَيْمَ كَانٌ وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ يَدْخُلُ فِي السِّنِّ كَانَ كَالْكَاتِبِ عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ।

)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد(

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, **রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,** যে ব্যক্তি যুবক বয়সে ইলম শিক্ষা করে সেটা পাথরের উপর অঙ্কনের ন্যায় হয়ে থাকে। আর বয়স হয়ে যাওয়ার পর যে ইলম শিক্ষা করে সে হল ঐ ব্যক্তির মত যে পানির উপর লেখে। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي شَبِيْبَتِهِ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فِي كِبَرِوَتُهِ فِي كِبَرِوَتُهِ مِنْهُ فَلاَ يَتْرُكُهُ فَلَه أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. (السنن الصغرى

لأحمد البيهقي برقم((

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যৌবনে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার থেকে ছুটেও যায় কিন্তু সে তাকে ছাড়ে না, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব। (আস-সুনানুস সুগ্রা)

হযরত আলক্কামা (রহ.) বলেছেন,

এটা কি? এটা কি?

قِرْطَاسٍ أَوْ وَرَقَةٍ. (الجامع
الأخلاق الراوي وآداب السامع(

অর্থাৎ, যুবক বয়সে আমি যা মুখস্থ করি তার অবস্থা এমন যেন আমি তা কাগজে বা পত্রে লেখা অবস্থায় চোখে দেখছি। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়াস সামি')

হযরত উমর (রা.) বলেছেন,

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا۔ (رواه البخاري تعليقا في باب الاغتباط في العلم والحكمة(

অর্থাৎ, তোমরা নেতৃত্ব অর্পিত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষা গ্রহণ কর। (বোখারী)

হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তিটি ঐসব যুবকদের বিশেষভাবে লক্ষ

করা উচিত যারা যৌবনে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে সময়টা কাটায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বের পেছনে। অথচ এখন নেতৃত্বের সময় নয় এখন সময় লেখাপড়ার। এখন লেখাপড়া, তারপর আসবে নেতৃত্ব প্রদানের পর্ব।

এক সময় কুফায় গড়ে উঠেছিল জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের জামাত। এর পেছনে ছিল তখনকার যুব সমাজের ইলমের দিকে অগ্রসর হওয়া। হযরত ইবনে সীরীন (রহ.) বলেছেন,

أَدْرَكْتُ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ شَابٍ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ.)الجامع لأخلاق الراوي وآداب
السامع(

অর্থাৎ, আমি কুফা নগরীতে এক হাজার যুবক পেয়েছি যারা ইলম সন্ধানে তৎপর ছিল। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি')

খতীবে বাগদাদী "আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" কিতাবে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন,

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে যুবক অবস্থায়ই নবী বানিয়েছেন। আর যুবক অবস্থায় আলেমকে যে ইলম দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে আর উত্তম নেই। (কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা)

হযরত লুকমান হাকীম তার পুত্রকে বলেছিলেন,

يا بُنَيَّ ابْتَغِ الْعِلْمَ صَغِيرًا، فَإِنَّ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ يَشُقُّ عَلَى الْكَبِيْرِ.

অর্থাৎ, বৎস! বয়স কম থাকতেই ইলম সন্ধান করে নাও, বৃদ্ধদের পক্ষে ইলম সন্ধান করা কঠিন। (প্রাগুক্ত)(যদি জীবন গড়তে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন)

"ইলম" আকিদা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে

ইলমে আকীদা হলো এমন জ্ঞান যা আল্লাহ, তাঁর গুণাবলী, নবীগণের সত্যতা, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক ও প্রমাণিত বিশ্বাস শিক্ষা দেয়।
যখন একজন ব্যক্তি আকীদার সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তখন:

তার ঈমানে কোনো সন্দেহ থাকে না,

শয়তানের সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর হয়,

সে পরীক্ষা-নির্যাতনের মুখেও ঈমান হারায় না,

তার ভিতরে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভরসা জন্মায়।

আল্লাহ তায়ালা তার কালামে পাকে বলেন,
اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

রাসূল (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাতে ঈমান এনেছে, যা তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল করা হয়েছে এবং (তাঁর সাথে) মুমিনগণও। তাঁরা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না (যে, কারও প্রতি ঈমান আনব এবং কারও প্রতি আনব না)। এবং তাঁরা বলে, আমরা (আল্লাহ ও রাসূলের বিধানসমূহ মনোযোগ সহকারে) শুনেছি এবং তা

(খুশীমনে) পালন করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মাগফিরাতের ভিখারী, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন —(আল বাকারা - ২৮৫)

এক দীর্ঘ হাদিস (যা আমরা হাদিসে জিবরীল নামে জানি) এ আমরা ইসলামি আকিদার মূল বিষয় গুলা ভালভাবে জানতে পারি,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» . قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» . قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ» ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيل أَتَاكُم يعلمكم دينكُمْ» . رَوَاهُ مُسلم

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ একজন লোক আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল একেবারে ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মাঝে সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে চিনতেও পারেনি। অবশেষে লোকটি নবী (ﷺ)-এর খুব কাছে গিয়ে বসল- তাঁর হাঁটুদ্বয়কে রাসূল (ﷺ)-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে বসল এবং তার দু'হাত তাঁর দু'রানের উপর রাখল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ (ﷺ)। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (ﷺ) বললেন, ইসলাম হচ্ছে, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। নামায পড়বে, যাকাত দান করবে এবং মাহে রমজানের রোজা রাখবে। পথ খরচের সামর্থ থাকলে হজ্জব্রত পালন করবে'। লোকটি বলল- صَدَقْتَ আপনি সত্য বলেছেন।

এতে আমরা বিস্ময়বোধ করলাম যে, লোকটি (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) প্রশ্ন করছ আবার (বিজ্ঞের ন্যায় উত্তর) সত্যায়নও করছে।
অতঃপর লোকটি পুনরায় বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ঈমান হল আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীর তথা ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ হতে হয় এ বিশ্বাস করা। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন।
(এরপর) লোকটি বলল, আমাকে ইসান সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, ইহসান হল-তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে করবে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তিনি প্রশ্নকারী থেকে বেশী অবহিত নন।
লোকটি বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (কিয়ামতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল) দাসী তাঁর মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি দেখতে পাবে যে, নাঙ্গা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি, পোশাকহীন ব্যক্তি, বকরীর রাখাল, সু-উচ্চ অট্টালিকায় পরস্পর অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা করছে। অতঃপর লোকটি চলে গেল। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। নবী করীম (ﷺ) আমাকে বললেন, হে উমার (রাযিঃ)! প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিখানোর জন্য তিনি এসেছিলেন। (মিশকাত থেকে মুসলিম)

নিচে এই হাদিসের আকিদা বিশ্বাসের প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

হাদীসের ব্যাখ্যা:
এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক হাদীছ। এর ভেতর রয়েছে সমগ্র দ্বীনের ব্যাখ্যা। ঈমান, ইসলাম ও ইহসান- এ তিনটি দ্বীনের প্রধান শাখা। এ হাদীছে এ শাখা তিনটির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বান্দার যাবতীয় প্রকাশ্য ও গুপ্ত আমল এর মধ্যে এসে গেছে। অন্তরের আমল ‘আকীদা-বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল 'ইবাদত-বন্দেগী সবই এ তিনটির অন্তর্ভুক্ত। নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে সহীহ-শুদ্ধ করা এবং আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করাও এর আওতাভুক্ত। সমস্ত আমলকে রিয়া ও লোকদেখানোর মানসিকতা থেকে মুক্ত রাখা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টাও এর অন্তর্ভুক্ত। শরী'আতের যাবতীয় 'ইলম এরই সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, এ হাদীছটি ‘উম্মুস-সুন্নাহ' (সমস্ত হাদীছ ও সুন্নাহ’র মূল) নামে অভিহিত

হওয়ার উপযুক্ত, যেহেতু হাদীছ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত সমগ্র ইলমের সারসংক্ষেপ এর মধ্যে এসে গেছে। বলা যায় এটা সমগ্র দীনেরই সারসংক্ষেপ।

এ হাদীছে দ্বীনের ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে প্রশ্নোত্তরের পন্থায়। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। শেষে আছে, তিনি আগমন করেছিলেন সাহাবায়ে কিরামকে দীনের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা তাঁর সে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে। তাই এ হাদীছটি ‘হাদীছে জিবরীল' নামে পরিচিত।

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রথম প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রথম প্রশ্ন করলেন ইসলাম সম্পর্কে

ইসলাম কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি সা দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ য় যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। এতে তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা করেছেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক কাজকর্ম দ্বারা। প্রথম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এটা মুখের কাজ। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রোযা রাখা ও হজ্জ করা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। এগুলো তিনভাগে বিভক্ত। শারীরিক, যেমন নামায পড়া ও রোযা রাখা। অর্থ সম্পদ সম্পর্কিত, যেমন যাকাত দেওয়া। তৃতীয়ত শারীরিক ও আর্থিক উভয় সংক্রান্ত, যেমন হজ্জ করা।

এখানে কেবল ইসলামের মৌলিক কার্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন স্থানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বহু কাজের উল্লেখ আছে। তা সবই ইসলামের শাখা-প্রশাখা। বস্তুত বাহ্যিক কার্যাবলীর সবই ইসলামের আওতাধীন। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারাই তা প্রমাণিত, যেমন এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

‘মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

অপর এক হাদীছে আছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت

ومن لم تعرف» ইসলামের শ্রেষ্ঠ আমল যে, তুমি মানুষকে অন্ন করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।'

মোটকথা, কুরআন ও হাদীছে যা-কিছু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা সব করা এবং যা-কিছু করতে নিষেধ করা হয়েছে সেসব থেকে বিরত থাকার দ্বারা এক ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারে। এ হাদীছে ইসলামের কেবল মৌলিক কাজসমূহই উল্লেখ করা হয়েছে। শরীর, সম্পদ ও যৌথভাবে উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক যাবতীয় কাজই এর আওতাধীন।

জিবরীল আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় প্রশ্ন তার উত্তর

জিবরীল আলাইহিস-সালামের দ্বিতীয় প্রশ্ন

ঈমান সম্পর্কে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ,তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তার কিতাবসমুহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষদিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের ব্যাখ্যায় ৬টি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যার প্রত্যেকটিরই সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথে। এই ছয়টি ঈমানের প্রধানতম অঙ্গ। মু'মিন হবার জন্য এর প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস রাখা জরুরি। এর যে-কোনও একটিত অবিশ্বাস করলে মু'মিন থাকে না। এর প্রত্যেকটিরও আবার ব্যাখ্যা আছে। কুরআন-সুন্নাহ'য় সে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস রাখতে হবে সেই ব্যাখ্যা মোতাবেক। যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই, এর দ্বারা তাওহীদের বিশ্বাস বোঝানো হয়েছে। তাওহীদ মানে একথা বিশ্বাস করা,এ বিশ্ব জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। বিশ্বজগত সৃষ্টিতে তার কোনও শরীক নেই। তাঁর কোনও শুরু ও শেষ নেই। তিনি সদা ছিলেন, সদা থাকবেন। তিনি সকলের রক্ষাকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ। তাঁর সত্তায় কোনও শরীক নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীতেও কোনও অংশীদার নেই। সৃষ্টির ইষ্ট অনিষ্টের তিনি একচ্ছত্র মালিক। তিনি কারও কোনও উপকার করতে চাইলে কেউ তা রদ করতে পারে না এবং কারও ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা ঠেকাতে না। তো তিনি একাই যখন সমস্ত উপকার-ক্ষতির মালিক, তখন মা'বৃদও কেবল তিনি একাই হতে পারেন। 'ইবাদত কেবল তাঁর একারই করা যেতে পারে। ‘ইবাদতে অন্য শরীক করার কোনও বৈধতা নেই।

এমনিভাবে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের মানে- আল্লাহ 'তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বহু নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকেই নবী হিসেবে বিশ্বাস করা জরুরি। যে যুগে যে নবী আসেন, সে যুগের মানুষের কর্তব্য তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা এবং তাঁর আনীত বা প্রচারিত শরী'আত মেনে চলা।এ ধারার সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন কিয়ামত পর্যন্ত সারা জাহানের সমস্ত মানুষের কর্তব্য তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর আনীত শরী'আতের পাবন্দী করা। রাসূলগণের প্রতি এ ব্যাখ্যার সাথেই বিশ্বাস স্থাপন জরুরি। এছাড়া তাঁদের প্রতি বিশ্বাস যথার্থ বিশ্বাস বলে গণ্য হবে না।

এভাবেই ঈমানের বাকি চারটি মূল অঙ্গের প্রতিও কুরআন ও সুন্নাহ'য় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে বিশ্বাস রাখা অবশ্যকর্তব্য। মনগড়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর কোনও একটি অঙ্গে বিশ্বাস আনয়ন করলে তা সত্যিকারের ঈমান বলে গৃহীত হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীছে যে ঈমান ও ইসলামের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা কেবলই শাব্দিক, পারিভাষিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ব্যবহারিক দিক থেকে নয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ঈমান হচ্ছে অন্তরের কাজ। অর্থাৎ যে সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরি, আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে বান্দার আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যস্বীকার, যা বাহ্যিক কাজের দ্বারাই সম্ভব। তাই এক রেওয়ায়েতে আছে, ইসলাম হল প্রকাশ্য বিষয় আর ঈমান অন্তরের গুপ্ত বিষয়। অর্থাৎ ইসলাম বাহ্যিক কার্যাবলীর নাম, যা প্রকাশ্যে করা হয়ে থাকে। আর ঈমান তো বিশ্বাস, তা প্রকাশ পায় না, অন্তরে গোপন থাকে।

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের তৃতীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর
হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল

ইহসান সম্পর্কে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন- ইহসান এই যে, তুমি আল্লাহর "ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে নাও দেখো,তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।

'ইহসান'-এর শাব্দিক অর্থ কোনও কাজ সুন্দরভাবে করা। এটা 'আদল'-এর উপরের স্তর। আদল হচ্ছে কোনও কাজ যথাযথ নিয়ম রক্ষা করে করা। তাতে কোনও ত্রুটি না রাখা। আর

ইহসান হচ্ছে সে কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত না হওয়া, বরং তাতে আরও বাড়তি সৌন্দর্য আরোপ করা। কারও সাথে লেনদেন দ্বারা এ উদাহরণ দেওয়া যায় যে, শাহেদ হাশেমের কাছে যা পাবে, শাহেদ তা পুরোপুরি আদায় করে নিল। আর হাশেম তার কাছে যা পাবে তা পুরোপুরি পরিশোধ করল, এটা আদল। কেননা এ লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। কিন্তু এতে বাড়তি কোনও সৌন্দর্য পাওয়া যায় না। কোনও মহানুভবতা লক্ষ করা যায়। না। তাই একে ইহসান বলা যাবে না। ইহসান হবে তখন, যখন হাশেম শাহেদকে তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশি দেবে এবং সে তার কাছে যা পাবে তারচে' কম নেবে।

এ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহসানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে এই বাড়তি সৌন্দর্যের ব্যাপারটা আছে। কেবল ফরয, ওয়াজিব আদায় করে ক্ষান্ত হলে যে 'ইবাদত হবে, তা হবে আদলের পর্যায়ে। ইহ্সান হবে যখন সে ইবাদত করা হবে এ মনোভাবের সাথে, যেন ইবাদতকারী আল্লাহ তা'আলাকে দেখছে। এটা ইহসানের প্রথম স্তর। একে 'মুশাহাদা' বা আল্লাহদর্শন বলে। আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছি, আমি তাঁর কাছে তিনি আমার সামনে অন্তরে এই ধ্যান থাকলে আল্লাহর ভয়, শ্রদ্ধাভক্তি এবং খুশূ'-খুযু' বেড়ে যাবে। ফলে ‘ইবাদতে বাড়তি যত্ন নেওয়া হবে এবং তাকে যতটা সম্ভব সুন্দর ও সুচারু করে তোলার চেষ্টা করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে এরকম মনোভাবের সাথে ইবাদত-বন্দেগী করার হুকুম দিতেন। এবং সাধারণত সাহাবায়ে কিরাম এভাবেই ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তাঁরা কেবল নামাযই নয়, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী এমনকি পার্থিব কাজকর্মও এমনভাবে আঞ্জাম দিতেন, যেন আল্লাহ সামনে আছেন এবং তাঁরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। এ বাক্যের দু'রকম ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।
এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটা ইহসানের দ্বিতীয় স্তর। একে মুরাকাবা বলে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যার পক্ষে ইহসানের প্রথম স্তরে উঠা অর্থাৎ মুশাহাদা বা আল্লাহদর্শন কঠিন মনে হয় সে ইহসানের দ্বিতীয় স্তর তথা মুরাকাবার সাথে ইবাদত করবে। সে চিন্তা করবে আল্লাহ আমাকে দেখছেন। তিনি আমার ভেতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে অবগত। এর দ্বারাও মূল উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই ধ্যানের সাথে ইবাদত করলে সুন্দর ও সুচারুরূপে ইবাদত করা সম্ভব হবে। বুযুর্গানে দীন বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর তোমার প্রতি আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা অনুপাতে এবং তাঁকে লজ্জা কর তোমার কাছে তাঁর নৈকট্য অনুসারে।

ইহসানের এ স্তরকে ইখলাসের মাকাম ও বলা হয়। যে ব্যক্তি এই ভাবনার সাথে ইবাদত করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন, তিনি তার কাছে আছেন এবং তিনি তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তখন তার ধ্যান গায়রুল্লাহ থেকে ছিন্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত থাকবে। তার লক্ষ্য মাখলুক থেকে সরে গিয়ে মা'বুদেরই অভিমুখী থাকবে। এরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় মুখলিস।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'তুমি তাঁকে দেখছ'- এ কথাটি দ্বারা ইহসানের দ্বিতীয় স্তর (মুরাকাবা) বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি প্রথম বাক্যে বর্ণিত মুশাহাদার কারণস্বরূপ । অর্থাৎ বান্দাকে যখন হুকুম দেওয়া হল সে ইবাদতের ভেতর আল্লাহ তা'আলার মুরাকাবা করবে এবং তাঁকে নিজের সামনে হাজির বলে চিন্তা করবে, যেন সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে, তখন তার কাছে মনে হতে পারে ব্যাপারটা তো অনেক কঠিন। আমার মত দুর্বল বান্দার পক্ষে এমন কঠিন ধ্যান কিভাবে সম্ভব? এ বাক্যে বলে দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়। কেননা তোমার তো ঈমান আছে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি তোমার ভেতর ও বাহির সম্পর্কে অবহিত। তোমার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে তোমার কিছুই গোপন থাকে না। তো তুমি তোমার বিশ্বাসের এই স্তরটি যদি ধ্যান করতে থাক, তবে একপর্যায়ে তোমার পক্ষে পরবর্তী স্তরে আরোহন সহজ হয়ে যাবে। তখন তুমি এ ধ্যানও করতে পারবে যে, আল্লাহ আমার সামনে আছেন, আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম নববী রহ. বলেন, আমদের কেউ যদি ইবাদত অবস্থায় এ চিন্তা করে যে, সে তার প্রতিপালককে দেখছে, তবে সে যথাসম্ভব খুশু-খুযু' রক্ষা করবে, সুন্দর ও সুচারুরূপে ইবাদত করবে, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে কাজে লাগাবে, পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী থাকবে এবং সর্বোতপ্রকারে তার ইবাদত পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন- তুমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে নিজ চোখে দেখে ইবাদত করার মত। নিজ চোখে দেখা অবস্থায় ইবাদতে পূর্ণতা আসে এ কারণে যে, বান্দা জানে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর তা জানে বলেই এ অবস্থায় সে কোনও ত্রুটি করে না। আর এ ব্যাপারটা তো ওই অবস্থায়ও বিদ্যমান থাকে, যখন সে তাঁকে দেখতে পায় না কিন্তু এ বিশ্বাস আছে যে, তিনি তাকে দেখেন। বস্তুত হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাকে তার ইবাদতে ইখলাস ও মুরাকাবায় উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তার ইবাদতে খুশু খুযু ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। ইহসানের সাথে ইবাদত করলে তা অবশ্যই থাকবে। কেননা বুযুর্গানে দীন সালিহীনের সাহচর্য অবলম্বন করতে বলে থাকেন তো এ কারণেই যে,

তা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পথে বাধা হয়। তা বাধা হয় তাদের প্রতি ইহুতিরাম ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে এবং তাদের লজ্জায়। সালিহীনের সম্মান রক্ষা তাদের লজ্জার কারণে যদি মানুষ অন্যায়-অনাচার থেকে দূরে থাকে, তাহলে যে আল্লাহ মানুষের ভেতর-বাহির সবকিছু সম্পর্কে অবগত এবং তার প্রকাশ্য-গুপ্ত সবকিছু জানেন তাঁর ধ্যান কেন ভুল-ত্রুটি করার পক্ষে বাধা হবে না? মোটকথা হাদীছ বোঝাচ্ছে, তুমি যখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখছ বলে মনে কর, তখন তো ইবাদতের যাবতীয় আদর রক্ষা কর কেবল এ কারণে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। কেবল তুমি তাঁকে দেখছ- এ কারণে নয়। তো তিনি সর্বদাই তোমাকে দেখছেন। সুতরাং তাঁর ইবাদত সুন্দরভাবে। আদায় কর, যদিও তুমি তাঁকে দেখতে না পাও। সংক্ষেপ কথা- তুমি সর্বদা আল্লাহর ইবাদত সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করতে থাক, কেননা তিনি তোমায় দেখছেন।

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের চতুর্থ প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামের চতুর্থ প্রশ্ন ছিল

কিয়ামত সম্পর্কে যে, তা কবে সংঘটিত হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছেন, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানে না। অর্থাৎ কিয়ামত কবে হবে সে সম্পর্কে সমস্ত মাখলুকের ‘ইলম একই পর্যায়ের। অর্থাৎ তারা কেউ তা জানে না। এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে এ কথা বলেননি যে, এ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না। বাহ্যত সেরকম বলারই কথা ছিল। তা না বলে এরকম ব্যাপকতার সাথে বলেছেন এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এ প্রশ্ন যাকেই করা হবে সে কেবল অজ্ঞতাই প্রকাশ করতে পারবে। কারও পক্ষেই বলা সম্ভব হবে না যে, কিয়ামত কবে হবে। কোনও কালেই এ সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানার প্রমাণ দিতে পারবে না। বস্তুত এ সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত এক হাদীছে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা ওই পাঁচ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তারপর তিনি পাঠ করেনঃ

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

কিয়ামতের আলামত

সবশেষে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম কিয়ামতের আলামত জানতে চাইলেন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- (ক) দাসী তার কর্ত্রীকে জন্ম দেবে এবং (খ) খালি পা ও নগ্ন শরীরের অভাবী মেষ রাখালদের দেখতে পাবে। (একসময়) উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে।

এখানে কিয়ামতের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। (ক) দাসী দ্বারা তার কর্ত্রীর জন্ম দেওয়া। দাসী কিভাবে কর্ত্রীকে জন্ম দেবে, উলামায়ে কিরাম তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে একটি এই- ছেলেমেয়ে তার মায়ের সাথে দাসীর মত আচরণ করবে। মনিব দাস-দাসীকে হুকুম দেয়। দাস-দাসী তা পালন করে। পালন না করলে। মেক দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তি দেওয়া হয়। এর বিপরীত হয় না। দাস-দাসী মনিবকে হুকুম দেয় না। হুকুম দেওয়ার সাহস করে না। পিতামাতা ও সন্তানের। ব্যাপারটাও কিয়ামতের আগে এরকমই হবে। সন্তান পিতামাতাকে দাস-দাসীর মত হুকুম করবে। ধমক দিয়ে কথা বলবে। আরও বেশি হতভাগা হলে নির্যাতনও করবে। পিতামাতা সন্তানকে কোনও হুকুম দেওয়ার সাহস করবে না। ধমক দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এককথায় কিয়ামতের আগে ব্যাপকভাবে পিতামাতার অবাধ্যতা করা হবে। সে কাল কি এসে গেল?

(খ) জুতা ও জামা-কাপড় নেই এমন অভাবী রাখালদের উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। এর মানে নিম্ন শ্রেণীর লোকের উপরে উঠে যাওয়া। তারা হবে দেশের নেতা, প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক হয়ে যাবে এবং কে কার চেয়ে শানদার বাড়ি বানাতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। হযরত হুযায়ফা রাযি. বর্ণিত এক হাদীছে আছে, ততদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা বিত্তবান হবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। হযরত আবূ যর্র রাযি. বর্ণিত হাদীছে আছে, নিম্ন শ্রেণীর মানুষ প্রভাবশালী হয়ে যাবে। হযরত আনাস রাযি থেকে, বর্ণিত হাদীছে আছে, নির্বোধ শ্রণীর মানুষ সমষ্টিগত বিষয়ে কথা বলবে। এক বর্ণনায় আছে, ফাসিক লোকে জনসাধারণের বিষয়ে কথা বলবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. বর্ণিত হাদীছে আছে, শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিচে ফেলে রাখা হবে আর মন্দ লোকদের উপরে উঠে হবে। এক বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক গোত্রের নেতৃত্ব দেবে মুনাফিক শ্রেণীর লোক। সবগুলো বর্ণনার সারমর্ম হল কিয়ামতের আগে অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে যাবে। জাহেল ও ফাসিক শ্রেণীর লোক বিপুল অর্থের মালিক হবে এবং সমাজের নেতৃত্ব দান করবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে সংক্ষেপে বলেছেন

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فالنظر الساعة

'যখন অযোগ্য লোকের উপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।"

হতদরিদ্র রাখালের ইলম ও আদব-কায়দা শেখার অবকাশ কোথায়? হঠাৎ করেই এরা যখন বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হয়ে যাবে এবং দেশের নেতৃত্ব লাভ করবে, তখন তাদের আচার-আচরণ কেমন হবে সহজেই অনুমেয়। তারা হালাল-হারাম নির্বিচারে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকবে। মানুষের হক আদায় তো করবেই না, উল্টো তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাবে। এ শ্রেণীর মানুষের কাছে দীনদার ও চরিত্রবান লোকের কোনও মর্যাদা থাকবে না। তারা তাকওয়া-পরহেযগারীর মূল্য দেবে না। সর্বদা অসৎ ও দুর্বৃত্তপরায়ণ লোকই তাদের ঘিরে রাখবে। তাদেরকে তারা বেশি আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে। তাদের উৎপাতে সমাজের শান্তি-শৃংখলা ধ্বংস হবে। সুশিক্ষা ও তালীম তরবিয়াতের মেহনত বন্ধ হয়ে যাবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের পরিবেশ থাকবে না। ফলে মানুষের আখলাক-চরিত্রের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়বে। সারা জাহান পাপাচারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। এহেন পাপ পঙ্কিল জগতকে বাকি রাখার প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার থাকবে না। অচিরেই কিয়ামত হয়ে যাবে।

এ হাদীছে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বিশেষভাবে উঁচু ভবন নির্মাণে প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় উঁচু দালান-কোঠা নির্মাণের রেওয়াজ ছিল না। তখন বাড়ি-ঘর হত নিচু। কেবল প্রয়োজন পরিমাণ। উম্মাহাতুল মু'মিনীন (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ) এর ঘর কেমন ছিল? কতটুকু উঁচু ছিল? হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, আমি হযরত 'উছমান রাযি.-এর আমলে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতাম। আমি উপরে হাত তুলে দেখেছি আমার হাত ছাদে লেগে যায়। উঁচু ঘর করার রেওয়াজ হয়েছে পরবর্তীকালে। যখন ইরান ও রোম পরাজিত হয়, তাদের দেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে, তখন তাদের দেখাদেখি মুসলিমগণও বিশেষত মুসলিম রাজা-বাদশাগণ উঁচু অট্টালিকা নির্মাণে মনোযোগী হয়ে পড়ে। অধঃপতনের শুরু তখন থেকেই।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয়ঃ

ক. এ হাদীছ দ্বারা ইহসান ও মুরাকাবার শিক্ষা পাওয়া যায়। সুন্দর আমল ও আদর্শ জীবন গড়ার লক্ষ্যে মুরাকাবার কোনও বিকল্প নেই। জীবনের প্রতিটি কাজেই 'আল্লাহ দেখছেন এ ধ্যান অন্তরে জাগ্রত রাখা উচিত।

খ. অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা জ্ঞান অর্জনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

গ. অন্যদের শিক্ষাদান করারও একটি ভালো উপায় তাদের সামনে 'আলেম ও জ্ঞানীজনকে প্রশ্ন করা।

ঘ. যে বিষয়ে জানা নেই, সে বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত আমি জানি না।

ঙ. নিজ বাসগৃহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বড় ও উঁচু করা পসন্দনীয় নয়।

এ হাদীছে এছাড়া আরও বহু শিক্ষা আছে। মনোযোগী পাঠকের পক্ষে সহজেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব।
রেফারেন্স: ব্যাখ্যা সূত্রঃ_ রিয়াযুস সালিহীন (অনুবাদ- মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম হাফি.)

বর্তমান সময়ে ইলম অর্জন এর প্রতিবন্ধক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর যুগ থেকে ১৩০০ বছর পর্যন্ত মুসলিমদের সারা বিশ্বে প্রভাব ছিল। যার কারণে আলেম-ওলামা ও তলাবা; তাদের সমাজে তাদের একটা ভালো প্রভাব ছিল। তাছাড়া তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা এতটা প্রভাব বিস্তার ছিল যে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি শক্তিশালী অবস্থান ছিল। ফলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেউ হীনমন্যতার চোখে দেখতনা।

কেউ কুরআন কেউ বা হাদিস কেউবা তারিখ যদি ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামিক জ্ঞান করে ফকিহ ও মুহাদ্দিস হয়েছেন।এবং যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তাইতো আজো আমরা তাদের এক এক জনকে ইমাম হিসেবে গণ্য করি।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯২৪ সালে ইসলামিক খিলাফা ও ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পরে; নাস্তিক মুরতাদ কুফফার ব্যক্তিরা এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়।

একটি কথা বাস্তব সেটি হল, পরাজয় শক্তি বিজয়ী শক্তির চিন্তা চেতনা ও তাদের সংস্কৃতি ধারণ করে। যার ফলে মুসলিমরা আস্তে আস্তে হীনমন্যতায় ভুগে।

কুফফার দের তৈরি করা বিভিন্ন মতবাদের ফাঁদে পড়ে আমাদের মুসলিমরা তাদের ঈমান ও আকিদার বিশ্বাস আজ চরম বিপর্যস্ত।

বর্তমান সমাজের কিছু নষ্ট ঈমান ধ্বংসকারী মতবাদগুলো - যেমন: জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ, কমিউনিজম, গণতন্ত্র, ক্রুসেড, ইত্যাদি। নানান মতবাদের ফাঁদে ফেলে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে কলুষিত করে ফেলেছে। কুফফারদের বস্তুবাদী উন্নতি তাদের নানা সংস্কৃতির আগ্রাসন চাকচিক্যের মোহে পড়ে আমাদের মুসলিম সমাজ আজ সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে। এ যেন এক ইরতাদিয়া(ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া) সমাজ তৈরি হচ্ছে।আল্লাহ তায়ালার কাছে এ থেকে আমরা পানা চাই।

ইলম অর্জনে মুজাহাদা ও সবর

মুজাহাদাঃ তাসাউফ এর পরিভাষাই - "মুজাহাদা হলো—আল্লাহর রাস্তায় নফসকে দমন ও তার বিরুদ্ধাচরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।"

আল্লাহর প্রতি ইমান আনা থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকটি কাজে শয়তান আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাই। আর ইসলামিক জ্ঞান অর্জন তথা ইলম হাসিল করা তো ইবাদত এর থেকেও উত্তম বলা হয়েছে অনেক হাদিসে। কেননা আমরা এই দ্বীনি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব মহত্ত্ব তার কালামে পাককে বুঝতে পারি এবং তার সকল নবী আলিহিমুস সালাম এর দ্বীনি কাজের প্রচার প্রচারণা ছিল ইলমে ওহি। আর এই ইলমে ওহির মাধ্যমেই আমরা শির্ক, বিদআত,কুফর ইত্যাদি ইসলামের নানান খুঁটিনাটি বিষয় জানতে সক্ষম হয় এবং এগুলো পুরোপুরি পালন করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা যায়।

প্রতিটা যুগে প্রতিটা নবী অনেক কষ্ট মোজাহাদা করে দ্বীন প্রচারের কাজ করেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মতেরা শুধুমাত্র তাদের সময়ের নবীর আনিত বানির মাধ্যমে তাদের

প্রতিটা কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। উম্মতের দ্বীন প্রচার কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেননি।

অপরদিকে আমাদের পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত ব্যতিক্রম। কালামে পাকে এরসাদ হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। ৫০ কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।—(আলে ইমরান - ১১০)

অপর একটি আয়াত এ আছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী। পূর্বে তুমি যে কিবলার অনুসারী ছিলে, আমি তা অন্য কোনও কারণে নয়; বরং কেবল এ কারণেই স্থির করেছিলাম যে, আমি দেখতে চাই- কে রাসূলের আদেশ মানে আর কে তার পিছন দিকে ফিরে যায়, সন্দেহ নেই এ বিষয়টা বড় কঠিন, তবে আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, তাদের পক্ষে (মোটেই কঠিন) না। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমান নিস্ফল করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।
—(আল বাকারা - ১৪৩)

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎকৃষ্টতা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।–(মায়ারেফুল কুরআন)

আমরা যারা উম্মতে মোহাম্মদী আছি তাদের কুরআন এবং হাদীসে অনেক ফজিলত আছে। এসব শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফজিলতের কারণে যুগে যুগে সাহাবী,তবেইন, তাবেতাবেইন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটে অনেক কষ্ট সাধনা করে পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। এবং এসব মহা মনীষীর কাছে আমাদের বড় বড় ইমামরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিন শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। যার ফলে ১৪ শত বছর পরেও আজও আমরা সেই একই কোরআন এবং হাদিস পঠন পাঠন এবং মানুষদের মাঝে দাওয়াতের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। রাসুলের (সাঃ) এর যুগে আহলে সুফফা বাসিরা খেয়ে না খেয়ে জীর্ণশীর্ণ পোশাক পড়ে তারা পড়ে থেকেছে একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর কাছে দ্বীন ইসলাম শেখার জন্য।

আমাদের বড় বড় ইমাম ও মুজতাহিদগণ (যেমন: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি’ঈ, ইমাম আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহ ইত্যাদি) দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে অসাধারণ মুজাহাদা ও কষ্ট সহ্য করেছেন। তারা যে কত কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে উম্মতের জন্য দ্বীন রেখে গেছেন, তা ইতিহাসে প্রমাণিত নিচে কিছু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক দলিল ও ঘটনা তুলে ধরা হলো:

১. ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله):

তিনি ৪০ বছর ফজরের ওযুর দ্বারা ইশার নামাজ আদায় করেছেন — এটি তার ইবাদত ও মোজাহাদার পরিচয়।

তিনি হাজার হাজার মাসআলার ফিকহি বিশ্লেষণ করেছেন দিন-রাত পরিশ্রম করে।

তাফসির, হাদীস, কিয়াস, ইজমা—সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান লাভের জন্য দীর্ঘ সফর করেছেন এবং প্রায় ৪০০০+ আলেমের থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেছেন।

২. ইমাম মালিক (رحمه الله):

বুখারী শরীফে এসেছে, তিনি যখন হাদীস পাঠ করাতেন, তখন শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা থাকলেও চেহারায় তা প্রকাশ করতেন না — সম্মানের কারণে।

‘মাওত্তা’ সংকলনের জন্য তিনি শত শত হাদীস বাছাই করে ১৭২৬টি হাদীস নির্বাচন করেন— অসাধারণ অধ্যবসায়।

৩. ইমাম শাফি’ঈ (رحمه الله):

তিনি ছোটবেলায় এত গরীব ছিলেন যে, নিজের লেখা কাগজ না থাকায় চামড়ার টুকরা, হাড় ও পাথরে লিখে জ্ঞান অর্জন করতেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ, ১০ বছর বয়সে মাওত্তা মুখস্থ!

তিনি ইয়ামান থেকে মক্কা, মদিনা, ইরাক, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে সফর করেছেন ইলমের জন্য।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله):

তিনি হাদীস সংগ্রহ করতে প্রায় ৪৫০০ কিলোমিটার সফর করেন, শত শত মুফতি ও মুহাদ্দিসের নিকট থেকে জ্ঞান গ্রহণ করেন।

একবার হাদীসের সত্যতা যাচাই করতে বাগদাদ থেকে শামে একটি মাত্র হাদীসের জন্য গিয়েছিলেন।

খলিফা مأمون ও মু‘তাসিমের যুগে মেহনত ও নির্যাতনের পাহাড় পার করেছেন, কিন্তু হক্ক থেকে বিচ্যুত হননি (خلق القرآن ফিতনা)।

৫. অন্যান্য বড় ইমাম ও মحدثগণ:

ইমাম বুখারী (رحمه الله):

হাদীস সংগ্রহের জন্য প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার সফর করেছেন।

সহীহ বুখারীর প্রতিটি হাদীস লেখার আগে গোসল করে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

ইমাম নওয়াবী (رحمه الله):

দিনে প্রায় ১৮–২০ ঘণ্টা পড়াশোনায় ব্যয় করতেন।

পুরো জীবনে বিয়ে, চাকরি, বিশ্রাম কোনোটাই করেননি—শুধু ইলম ও লেখা নিয়ে ছিলেন। এসব মহা মনীষীর জীবনে থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান সময়ে আমরাও আলেমদের সান্নিধ্যে গিয়ে যতই কষ্ট হোক আমরা ইলম অর্জন করে নিজেকে দিনের পথে চালিত করার চেষ্টা করি এবং এই দিনের আলো আমার দেশ জাতি অন্যান্য ভাইদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যান অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

সবর: দ্বীন ইসলামের কাজ বিশেষত ইল অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর সবর প্রয়োজন। ইসলামিক জ্ঞান অর্জনে সবর (ধৈর্য) একটি অপরিহার্য গুণ, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবা, তাবেঈন এবং ইমামগণ বাস্তবে দেখিয়েছেন। ইলম হাসিল করা সহজ নয়—এতে কষ্ট, ত্যাগ, সময় ও অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। নিচে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে সবরের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

কুরআনে সবরের গুরুত্ব (ইলম প্রসঙ্গে):

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم...

(সূরা কাহফ: ২৮)
অর্থ: "তুমি নিজেকে ধৈর্যসহ তাদের সঙ্গে রাখো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে ডাকে..."

ইমাম কুরতুবি ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন: এ আয়াতে 'সবর' মানে: ইলমের পথের ক্লেশ-ধৈর্য, দরসে বসা, শেখা, বারবার রিভিশন, দুনিয়াবি স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গ গ্রহণ।

হাদীসে সবরের গুরুত্ব (ইলমের পথে):

قال النبي ﷺ:
"من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة"
(مسلم: 2699)

অর্থ: “যে ব্যক্তি কোনো পথে জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”

এখানে 'পথ' মানে শুধু রাস্তা নয়, বরং সময়, শ্রম, ক্লান্তি—সব মিলিয়ে সবর।

আমরা কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি এখানে আমাদের সবর প্রয়োজন। কেননা,যারা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করে তাদের পেছনে সব সময় শয়তান লেগে থাকে কিভাবে তাকে এই মোবারক পথ থেকে বিচ্যুতি করা যায়। দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে হাদিসে এসেছে,

قال رسول الله ﷺ:
"فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ".
)سنن الترمذي: ২৬৮৫, وقال: حديث حسن(

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“একজন আলেমের মর্যাদা একজন ইবাদতকারীর উপর এমনই, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে নিচু ব্যক্তির তুলনায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আকাশ-যমীনের অধিবাসীগণ, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়—এমন ব্যক্তির জন্য দোআ করতে থাকে।”

তাই আমাদেরকে এসব বর্ণনা কে সামনে রেখে যে কোন কষ্টকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে সবরের সাথে। ফলে আমরা ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হব। আমরা তখনই সফল হব যখন প্রতিটি কাজ বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিটি কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যাব। অনেক সময় নানান বাধা আসবে যেমন, টাকার সমস্যা, খাওয়ার সমস্যা, যে জায়গায় জ্ঞান অর্জন করতে যাব সে জায়গায় থাকার সমস্যা এগুলোকে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সামনে এগিয়ে যাব।

হতাশা ও হীনমন্যতা দূর করার গুরুত্ব

অনেক তালিবে ইলম হীনম্মন্যতায় ভোগে। ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে, এই ফকীরী বিদ্যা শিখে কী হবে? এই বিদ্যা শিখে সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না, এই বিদ্যা শিখে রাষ্ট্রের কোন মর্যাদা পাওয়া যায় না, কোন পদ পাওয়া যায় না, টাকা-পয়সার লাইন হয় না, ইত্যাদি। এসব কথা শুনে কোন কোন তালিবে নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধের শিকার হয়, হীনম্মন্যতায় ভোগে। অথচ পূর্বে এই ইলমের যেসব মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে তা সামনে রাখলে একজন তালিবে ইল্ম কোনো রকম হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে না। তালিবে ইল্ম কেন হীনম্মন্যতায় ভুগবে? সে কেন নিজেকে ছোট মনে করবে? সে তো দু' জাহানের সরদার নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ হতে যাচ্ছে। সে তো জান্নাতের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে তো দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে উঁচু মর্যাদা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে তো এত মর্যাদার অধিকারী যে, তার জন্য ফেরেশতারা তাঁদের পর বিছিয়ে দেয়। সে তো এত ভাগ্যবান যে, সে ইল্ম তলব করার সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর 'ছাকীনা' তথা স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ্র রহমত তাকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাকে বেষ্টন করে নেয়। সে তো এত ভাগ্যবান ব্যক্তি (আলেম) হতে যাচ্ছে যার জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমনকি পানির গর্ভের মাছ পর্যন্ত দুআ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সে তো এত ভাগ্যবান যে, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করে একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও বেশি ফযীলত অর্জন করে থাকে। আর ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করে এক হাজার রাকআত নফল নামায থেকেও বেশি ফযীলত অর্জন করে থাকে। সে তো এত ভাগ্যবান যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে এই সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন, অতএব সে কল্যাণময় ব্যক্তি, সে কল্যাণের প্রতীক! তালিবে ইলম ও আলেমের চেয়ে সম্মানী ব্যক্তি আর কে হতে পারে? তাঁদের চেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি আর কে হতে পারে? তাঁদের চেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কে হতে পারে? দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি, এতসব মর্যাদা ও সৌভাগ্যের প্রতীক হয়েও যে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে! দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি এই বিদ্যা দিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-দৌলত কম অর্জন হবে বলে এই মহা মর্যাদার বিদ্যাকে যে তুচ্ছ জ্ঞান করে! দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি এই ইলমের মর্যাদা ও প্রশংসায় আল্লাহ আল্লাহর রসূলের এতসব বাণী থাকা সত্ত্বেও কুরআন-হাদীছের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত কিছু মূর্খের অবাস্তব কথায় প্রভাবিত হয়ে যে নিজেকে হীন মনে করে, হীনম্মন্যতার শিকার হয়!(যদি জীবন গড়তে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন)

ইলম অর্জন না করার ক্ষতি

মানুষের ইলম শেখার গুরুত্ব অনেক বেশি। ইলম ছাড়া যেমন সঠিকভাবে আমল করা যায় না। আবার দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ বুঝতেও ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই ইলম শেখাকে ফরজ করা হয়েছে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি ঘোষণা দিয়েছেন, 'ইলম তালাশ করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক'। কিন্তু মুমিন মুসলমানের জন্য ইলম না শেখার ক্ষতি অনেক বড়। তা কী?

ইসলামের প্রতিটি অংশের সঙ্গে ইলম শেখা খুবই জরুরি। ইলম শেখা ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম শেখা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। এ কারণেই হজরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

'যে ব্যক্তি ইলম (শেখা) ছাড়া আমল করবে, সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে - না করবে; বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।' (তারিখে তাবারি)

ইলম না শেখার সব থেকে বড় ক্ষতি হল,

ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। অথচ আল্লাহকে ভয় করা মানুষের জন্য সেরা ইবাদত। ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণ থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজ করার তাওফিক অর্জন করা। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কোরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। ইলম শেখার কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে আল্লাহ ভয় উপলব্ধি করার তাওফিক দান করনে। ইলম না শেখার ক্ষতি বুঝাতে ইমাম রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইলম শেখার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। যা মানুষকে ইলম শেখার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী করে তোলে। আর তাহলো-

১. আসমান থেকে যেভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ঠিক সেভাবে ইলমও আসমান থেকে দান করা হয়।

২. বৃষ্টি হওয়ার ফলে যেভাবে ফসল ফলানোর জন্য জমিন তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ইলম অর্জন করার কারণে মানুষের মনে মানবিক সব গুণাবলী অর্জন হয়।

৩. আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ ছাড়া যেমন জমিনে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় না, ঠিক ইলম ছাড়াও মানুষ আল্লাহ তাআলা ইবাদাত-বন্দেগি করতে সক্ষম হয় না।

৪. আসমানের বজ্র ধ্বনি বা বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে যেভাবে বৃষ্টি হয় তেমনি ভাবে জান্নাতের আশা এবং জাহান্নামের ভয় মানুষকে ইলম শেখায় আগ্রহী করে তোলে।

৫. বৃষ্টি যেমন মানুষের জন্য অনেক সময় উপকারী হয় আবার কখনো অপকারী হয়, ঠিক ইলম সঠিকভাবে শেখার ফলে তা যেমন মানুষের জন্য উপকারী হয়। আবার সঠিক ইলম না শেখা বা সে অনুযায়ী আমল না করার কারণে তা অপকারীও হয়।' (তাফসিরে কবির)

ইলম অনুযায়ী আমল না করার ক্ষতি

ইলম, জ্ঞান, জানাশোনা- বান্দার প্রতি আল্লাহর প্রথম উপহার। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পরই আল্লাহ তায়ালা তাকে সব বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং ইলমকেই ফেরেশতাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি আদমকে নামগুলো সব শিক্ষা দিলেন তার পর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা বাকারা, আয়াত, ৩১)

অন্য আয়াতে এসেছে, 'মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন।' (সূরা রহমান, ৩-৪)

মানুষের এই জানাশোন বা জ্ঞান আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমল করো, অচিরেই তোমাদের আমলগুলো প্রদর্শন করা হবে।' (সূরা তাওবা, আয়াত, ১০৫)

জানাশোনা বা ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম ভয়াবহ শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন, 'বক্তব্য অনুযায়ী আমল না করা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ।' (সূরা সফ, আয়াত, ৩)

"ইলম হচ্ছে আমলের ইমাম"। দ্বীনি ইলম অর্জন করা ফরয। এই ফরয আদায় না করলে এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য তাকে শাস্তিও পেতে হতে পারে। তাই, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে- নিজে হাক্বীক্বী দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা এবং অধীনস্তদেরকে হাক্বীক্বী দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া। পাশাপাশি সে অনুযায়ী আমল করা এবং নিজের জীবন পরিচালনা করা।

মালিক ইবনু দিনার (রাহ.) বলেন,

অর্জিত ইলমের উপর আমল না করলে মসৃণ পাথরের উপর গড়িয়ে পড়া পানির মতো ইলম তার অন্তর থেকে ধুয়ে যায়।

কখনো ঝরনা দেখে থাকলে দেখবেন ঝরনার নিচের পাথর থেকে ক্রমাগত পানি ঝরে পড়ছে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, ইলম এভাবেই তার কাছ থেকে ঝরে পড়ে।

এমন কত ইলমওয়ালা আছেন যারা মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও নিজেরাই এ ব্যাপারে গাফেল? তাকওয়ার (আল্লাহর ভয়) বাণী প্রচারকারীদের মধ্যে এমন কতজন আছেন যারা নিজেরাই তাকওয়াহীন ও বেপরোয়া?
(-তাওহীদের মূলনীতি, পৃ. ১৫০)

যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করার পর আমল থেকে দূরে থাকল তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার বিচারের কাঠগড়ায় কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবে। **রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,** 'কিয়ামতের দিন বান্দার পদযুগল সরবে না, যে পর্যন্ত না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তার জীবনকাল কিরূপে অতিবাহিত করেছে, তার জ্ঞান কী কাজে লাগিয়েছে, তার সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কিসে খরচ করেছে এবং তার শরীর কিভাবে পুরানো করেছে?' (তিরমিযী, হা/২৪১৭, সনদ হাসান ছহীহ)।
কুরআনের ইলম অনুযায়ী যে আমল করবে না তাকে জাহান্নামে পাথর দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। (বুখারী হা/৭০৪৭)

এ প্রসঙ্গে ফুযাইল ইবনু ই'য়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَلَّمُوْا فَإِذَا عَلِمُوْا فَعَلَيْهِمُ الْعَمَل 'মানুষের জন্য শিক্ষার্জন করা আবশ্যক। আর যখন শিক্ষার্জন করবে তখন তা আমল করা আবশ্যক' (ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩৭)।
আব্বাসীয় খলীফা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুতায বলেন, عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرَة 'আমল ছাড়া ইলম ফলহীন বৃক্ষের মত' (ঐ, পৃ. ৩৭)।
অন্যত্র তিনি বলেন, عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِيْ قَوْلِهِ وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِيْ عَمَلِه 'মুনাফিকের জ্ঞান হল তার কথার মধ্যে আর মুমিনের জ্ঞান হল, তার কর্মের মধ্যে' (ঐ, পৃ. ৩৮)।
আবূ আব্দিল্লাহ রূযবারী বলেন,

الْعِلْمُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مَوْقُوْفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ وَالْإِخْلَاصُ لِلّهِ يُوَرِّثُ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَل

'ইলম নির্ভর করে আমলের উপর। আর আমল নির্ভরশীল ইখলাছের উপর। আর ইখলাছ আল্লাহর তরফ থেকে বুঝার ক্ষমতা এনে দেয়'। (তারীখু দিমাস্ক, ৫/১৮ পৃ.)

ইলমের সাথে ইলমের আদব শিক্ষা করা অপরিহার্য

আমাদের সালাফগণ ইলম শিখার আগে আদব শিখতেন। ইলম অর্জনের জন্য আগে নিজেকে যোগ্য করে তুলতেন। তারপর দারসে বসতেন।
— ইলম শেখার আগেই মূলত ইলমের আদব শেখা উচিত। যে ইলম নিজের আদব আখলাক কে পরিবর্তন করতে পারে না তা সত্যিকারের ইলম নয়।

ইমাম মালিক(রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

"تقول لي : اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه"

"আমার মা আমাকে বলল (ইমাম) রবীআহর নিকট যাও, এরপর তাঁর থেকে তাঁর ইলম শিক্ষার আগে তাঁর আদব শিখে নাও।"
(তারতিবুল মাদারিক ১/১৩০)
ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-

"طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم."

"আমি ৩০ বছর আদব শিখেছি আর ২০ বছর ইলম শিখেছি এবং সালাফুস সালেহীনরা ইলম শিখার আগে আদব শিখতেন।"(গায়াতুন নিহায়া ১/১৯৮)
তিনি আরও বলেন,
"আমরা যদি দুনিয়ার জন্য ইলম অন্বেষণ করি, তবে দুনিয়া মিলবে। যত বেশি তলব করব, ততই মিলবে। কিন্তু সেটা আমাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।" কারও কাছে অনেক কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আছে কিন্তু আদব নেই, তার দ্বীন অপূর্ণাঙ্গ।

.কারণ আদব বই পড়ে শেখা যায় না। আদব শিখতে হয় অনুশীলন করে। একজন মানুষের মধ্যে আদব আসে দীর্ঘ অনুশীলনের পর। সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম) আগে আদব শিখেছেন, তারপর শিখেছেন ইলম।

ইমাম ইবনুল জাওযী(রহ:) বলেন-

"كاد الأدب يكون ثلثي العلم."

“আদব হচ্ছে ইলমের এক তৃতীয়াংশ। ”[সিফাতুস সফওয়াহ ১/৪৫].
ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহহাব(রহ:) বলেন:

”ما تعلّمنا من أدبِ مالكٍ أكثرُ مما تعلّمنا من علمه.“

“আমরা মালিকের ইলম অপেক্ষায় তাঁর আদব সবচেয়ে বেশি শিখেছি।”[সিয়ারু আ’লা মিন নুবালা ৮/১১৩]

ইমাম শাফিই (র.) এর জীবনের একটা ঘটনা শেয়ার করছি।

ইমাম শাফিঈ (র.) তার দ্বীনের পড়াশোনা চুকিয়ে টানা দুই বছর পরে বাড়ি ফিরেছেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি তোমার সাথে কি নিয়ে এসেছ?” শাফিঈ (র.) জবাব দিলেন, “মা! আমি আমার সাথে এনেছি জ্ঞান এবং আদব”। তার মা বললেন, “তুমি ফেরত যাও বাবা! তুমি তোমার সাথে কিছুই নিয়ে আসোনি!” ইমাম শাফিঈ তো যারপরনাই অবাক! হতভম্ব হয়ে তিনি তার শিক্ষক ইমাম মালিকের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললেন। ইমাম মালিক (র.) তাকে উপদেশ দিলেন, “আবার তোমার মায়ের কাছে ফেরত যাও। তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে এবার উত্তর দিবে, “আমি আমার সাথে আদব এবং জ্ঞান নিয়ে এসেছি!”

“আগে আদব, পরে জ্ঞান!”

ইমাম শাফিঈ বাধ্য পুত্রের মত তার মায়ের কাছে ফেরত গেলেন এবং তাকে একই প্রশ্ন করা হল। এবার উত্তরে তিনি বললেন, “মা! আমি আমার সাথে আদব-আখলাক এবং জ্ঞান নিয়ে এসেছি!”

এ কথা শুনে তার মা দরজা খুলে সাদরে ছেলেকে গ্রহণ করলেন!রেফারেন্সঃ ইমাম শাফিঈ (র) এর ঘটনাটি নেওয়া হয়েছে “Greatest Moms of All Times” Online Course থেকে, Shaykh Suleiman.

ইলম প্রকাশ পায় ব্যক্তির আদব, আখলাক আর বিনয়ের মাধ্যমে। এজন্য ইলম শিখার আগে আগে দরকার আদব শিখা। আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী ইলম এবং আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

ইলম শেখার আগেই মূলত ইলমের আদব শেখা উচিত। ইমাম ইবনে সিরীন রাহ. (১১০ হি.) বলেন-

كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم

'তারা যেমন ইলম শিক্ষা করতেন তেমনি আচার-আচরণও শিক্ষা করতেন। (আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, (খতীব বাগদাদী ১/৭৯)

আমি একটু কম করেই বলেছি যে, ইলমের আগে না হলেও অন্তত ইলমের সাথে অবশ্যই ইসলামী আদব, বিশেষ করে ইলমের আদব শিখতে থাকা উচিত। কিন্তু এখন বাস্তবতা এই যে, প্রাতিষ্ঠানিক তলবে ইলমের যমানা শেষ হওয়ার পরও আমরা ইলমের গুরুত্বপূর্ণ আদব থেকেই উদাসীন থাকি। ইলম অর্জনের (?) পরও যেন আমরা আদব শেখার প্রতি আগ্রহী নই!

ফরয পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হল ইলম শেখার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নবী-আদর্শের পরিপন্থী কোনো উদ্দেশ্য যেন কখনোই না হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ প্রমাণিত-

لا تَتَعَلَّموا العلمَ لِتُبَاهُوا به العلماء، ولا تُمَارُوا به السُّفَهَاء، ولا تَخَيَّروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار.

অর্থ : এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।-(সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৭)

আমরা লক্ষ্য করি না যে, অনেক সময় আমরা উস্তাযের সাথে যেভাবে ইশকাল ও ইতিরায শুরু করি তা কখনো কখনো মুবাহাত ও মুমারাতের পর্যায়ে চলে যায়। আমরা চিন্তা করি না যে, এটা আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ; দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

বর্তমানে অনেক সময় উস্তাযের নিকট ইশকাল পেশ করার বৈধতার অপব্যবহার করা হয়। ইশকালের পরিবর্তে সরাসরি ইতিরায করা হয়। ইশকাল তো হল লাযিম মাছদার। যেমন বলা হয়ে থাকে-أشكل عليَّ كذا অর্থাৎ আমার কাছে এটি জটিল মনে হচ্ছে। কারো কাছে কোনো কথা বা বিষয় জটিল মনে হলে, কোনো বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে কিংবা কিতাবের কোনো কথার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার এই ইশকালটি যথাযথ আদব ও বিনয়ের সাথে উস্তাযের নিকট পেশ করতে পারে। কেননা এটি হল 'ইস্তিফহাম', যা ইলম শেখারই অংশ। তবে তা হতে হবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর। কারণ আলোচনার মাঝে থামিয়ে দেওয়াও আদব পরিপন্থী। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আলোচনার শেষভাগে আপনার ইশকালের উত্তর পাওয়া যাবে। তখন তো আপনি নিজেই লজ্জা ও সংকোচ বোধ করবেন।

আরেকটি আদব হল ইশকাল পেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণ করা এবং ইশকাল পেশ করার ক্ষেত্রে কখনো তর্কের ভাব প্রকাশ না পাওয়া। কেননা এটি মারাত্মক বেআদবী। আর তখন তা 'ইশকাল করা' থাকে না, 'ইতিরাযে' পরিণত হয়। ইশকাল পেশ করতে কোনো

বাধা নেই। কিন্তু ইতিরায করা সম্পূর্ণ আদবপরিপন্থী। ইতিরায তো হল আপত্তি করা, উস্তায ও আলোচনার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যাওয়া। এটি কীভাবে জায়েয হতে পারে? ইশকালের মর্ম বোঝার পর এ কথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তালিবে ইলম উস্তাযের কাছে শুধু এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করবে, যে বিষয়ে বাস্তবেই তার কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যে বিষয়টি তার জানা আছে, অন্য কোনো উস্তায বা আলেমের কাছে শুনেছে, কোনো শরহ বা হাশিয়ায় পেয়েছে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো কিতাব বা ইলমী সাময়িকীতে পড়েছে তা তো অজানা নয়। তবে কেন তা উস্তাযকে জিজ্ঞাসা করবে? তাও আবার দরসের মধ্যে?!

মুতালাআর প্রতি তাকিদ দেওয়ার একটি বড় হেকমত এটাও, যেন সব বিষয় উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তাই যে বিষয়টি জানা আছে, যে বিষয়ে কোনো ইশকাল বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি তা উস্তাযের নিকট জিজ্ঞাসা করার পিছনে কী রহস্য থাকতে পারে? সাথীদের অবগতি উদ্দেশ্য হলে তাকরারের সময় বলে দেওয়া যায়। তবে কি নিজের ইলম প্রকাশ করা উদ্দেশ্য? নাকি উস্তাযকে পরীক্ষা করা, উস্তাযকে পেরেশান করা উদ্দেশ্য? এগুলো কি ভালো কাজ? এগুলো ছাড়া আর কী হেকমত হতে পারে?(মাসিক আল-কাউছার - মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিঃ)

বর্তমানে যেসব জিনিসে ইলমের একাগ্রতা নষ্ট হয়

১. বেশি বেশি বাড়ি গেলে বা বেড়াতে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। বাড়ির পরিবেশ মনের ওপর কু-প্রভাব ফেলে এমন হলে এ থেকে বিরত থাকা চাই। নিতান্ত প্রয়োজন হলে তার কথা ব্যতিক্রম। এমনিভাবে ব্যতিক্রম যদি বাড়িতে ইলমের পরিবেশ থাকে।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া- নিতান্ত প্রয়োজন না হলে এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

২. বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া, এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করা- এসব থেকে তো সমূলেই বিরত থাকা চাই। এসব থেকে এ কারণে বিরত থাকা চাই যে, এগুলো পড়ার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়, ইলমের প্রতি মনোযোগকে নষ্ট করে দেয়।

৩. সম্প্রতি বহু তালিবে ইলম মোবাইল ব্যবহার করার কারণে ইলমের প্রতি মনোযোগ আরোপ করা থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। মোবাইলে নানান জনের সাথে যোগাযোগ

এবং সেই যোগাযোগের ফলে মস্তিষ্কে বহু রকমের চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটার কারণে ইলমের মনোযোগ নেই হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে আরও দুঃখজনক হল মোবাইলে নানান রকম খারাপ কিছু দেখে পড়ার একাগ্রতা নষ্ট করার পাশাপাশি চরিত্রও ধ্বংশ করে ফেলছে।

আমাদের আকাবির মনীষীদের অনেকের ইতিহাস এরকম যে, ছাত্রজীবনে তাদের কাছে কোন চিঠিপত্র এলেও তারা বার্ষিক পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সেগুলো খুলে দেখতেন না এই আশংকায় যে, কোন পত্রের কোন খবরের কারণে যদি মন অন্যদিকে চলে যায় বা বাড়িতে যেতে হয়! অথচ এখনকার ছাত্ররা প্রতিদিন মোবাইলের মাধ্যমে বহুবার শুধু বাড়ির খবর নয় নানান জনের খবর নিয়ে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত রেখে চলছে। এব্যাপারে সকলেরই শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

৪. পত্র-পত্রিকা পাঠ করা দ্বারাও মনে নানান রকম চিন্তার উদ্রেক হয়। শুধু দেশের নয় গোটা দুনিয়ার চিন্তা মাথায় ঢোকে। ছাত্রের এখনও এতসব চিন্তা মাথায় ঢোকানোর সময় আসেনি। এতসবকিছু মাথায় ঢোকালে পড়ার একাগ্রতা সেই সবকিছুর মধ্যে হারিয়ে যাবে। ইলমের পোক্তা সৃষ্টির পর সময় আসবে যখন যুগ-জগৎ সম্বন্ধে জানার ও সব বিষয়ে সচেতনতা অর্জনের প্রয়োজন পড়বে, তখন পত্র-পত্রিকা পাঠ করাতে এরূপ অসুবিধে থাকবে না। সেই সময়ের অপেক্ষা করুন। এখনই এতসব সচেতনতা অর্জন করতে গেলে আসল বিষয়ে সচেতনতায় ঘাটতি থেকে যাবে।

৫. সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়ানো।

৬. রাজনীতিতে জড়ানো।

সারকথা ইলমের খাতিরে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু এই ইলমের মধ্যেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে।

ইলমের খাতিরে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু এই ইলমের মধ্যেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে- এর কিঞ্চিত বিবরণ দিতে গিয়ে খতীবে বাগদাদী বলেছেন, ব্যবসার দোকান লাটে উঠুক, ফসলের বাগান বিরাণ হয়ে যাক, আপনজন বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাক্ত হোক, পরিবারের কেউ মারা গেলে অন্যরা তার জানাযা সম্পন্ন করুক, সে শুধু ইলম নিয়েই মশগুল থাকবে- এমন না হলে এই ইলমের ধরা-ছোয়া পাওয়া

যাবে না। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি')

শায়খ বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ বলেছেন, এখানে কথার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বোঝানো যে, ইলমের জন্য একাগ্রতা চাই, অন্যসব চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া চাই। কোন কোন মনীষী তালিবে ইলমকে এমন কথাও বলেছেন, রঙিন কাপড় পরিধান কর, তাহলে ধোয়ার চিন্তাও করতে হবে না। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

(৭) ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর একটি শর্ত হল সময়ের গুরুত্ব দেয়া। অর্থাৎ, সময় নষ্ট না করা, পূরো সময়কে কাজে লাগানো। সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে মনে করি না। কে না জানে জীবন মানেই হল কিছু মুহূর্তের সমষ্টি? একটা মুহূর্ত চলে যাওয়া অর্থ জীবনের একটা অংশ ফুরিয়ে যাওয়া। জনৈক কবি বলেছেন,

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا + مَضَى نَفَسٌ مِنْهَا انْقَضَتْ بِهِ جُزْءًا

অর্থাৎ, তোমার জীবন তো হল হাতেগোণা কয়েকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি। একটা শ্বাস ছাড়ার অর্থ জীবনের একটা মুহূর্ত পার হয়ে যাওয়া।

জীবনে যারা বড় হয়েছেন, সময়ের গুরুত্ব দিয়েই বড় হয়েছেন। আকাবির উলামা ও সুলাহা কীভাবে জীবনের সময়ের মূল্য দিয়েছেন এবং সময়কে ইলমের কাজে ব্যয় করেছেন তার বহু ঘটনা হযরত শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা (রহ.) তাঁর "কীমাতুয যামানি ইন্দাল উলামা" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (যদি জীবন গরতে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন হাফিঃ)

কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরি (বুখারি)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

“সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।”(সুরা মুহাম্মাদ আয়াত ১৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয় ওয়ারিস। তাঁরা ইসলামের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম অর্জন করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

أَنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে।" (সুরা ফাতির ৩৫-২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُوْنَ

"আলিমরা ছাড়া তা কেউ বুঝে না।"(সুরা আনকাবুত ২৯-৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"তারা বলবে, যদি আমরা (গ্রহণের জন্য) শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (সুরা আল-মুলক ৬৭-১০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ

"বলুন, যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা কি সমান?" (সুরা আয যুমার ৩৯-০৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়।

হযরত আবু যর রা. তাঁর ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার উপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি কিছু কথা বলতে পারব, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তবে

অবশ্যই আমি তা বলবো। **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী**- “উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়”।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, (كونوا ربانيين)(তোমরা আল্লাহ ওয়ালা- রব্বানী হও)। এখানে ربانيين অর্থ প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয়, رَبَّانى তাঁকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

এই শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে কোনো কথা বলার আগে এবং কোনো কাজ করার আগে যথাযথ ইসলামি জ্ঞান থাকা জরুরি।

ব্যাখ্যাঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, একথা বুঝানো যে, ইলম সত্ত্বাগতভাবে বচন ও আমলের উপর প্রাধান্য রাখে। সমস্ত আমল ও উক্তি ইলমের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উক্তি ও আমলের সঠিকত্ব ইলমের উপরই মওকুফ। যখন জানবেই না তখন কোন কথা বলবে কিভাবে? আমল করবে কিভাবে? তাছাড়া মর্যাদাগতভাবেও আমলের উপরে ইলমের ফযীলত রয়েছে। কারণ, ইলম হল, কলবের আমল। কলব হল, সর্বশ্রেষ্ঠ দৈহিক অঙ্গ। আর আমল ও উক্তির সম্পর্ক শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা, যবান ইত্যাদির সাথে রয়েছে, সেগুলো কলবের তুলনায় নিচু পর্যায়ের।(নাসরুল বারী শরহে বুখারি, প্রথম খণ্ড)

উপকারিতা;

1. ভুল থেকে রক্ষা:

না জেনে কথা বললে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে, আর না জেনে কাজ করলে তা বিদআত বা গুনাহ হতে পারে।

2. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:

সঠিকভাবে আমল করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

3. আমল গ্রহণযোগ্য হয়:

ইলম ছাড়া আমল করলে সেটা নেক কাজ হলেও হয়তো তা কবুল হবে না, কারণ তা হয়তো শরীয়তের পরিপন্থী।

উদাহরণ:

কেউ যদি নামায না শিখে পড়তে শুরু করে, তবে তার নামায হয়তো সহীহ হবে না। সেজন্য নামাযের ফরয, ওয়াজিব, শর্ত, রোকন শিখে তারপর নামায পড়া উচিত।

উপসংহার:
ইসলামে যেকোনো কথা বা কাজ করার আগে সঠিক জ্ঞান বা 'ইলম' অর্জন করা ফরয। কারণ জ্ঞানই পথ দেখায়, আর পথ না জানলে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

পড়তে ইচ্ছে করে না- এ রোগের চিকিৎসা

পড়তে ইচ্ছে না করা একটা রোগ। এ রোগের চিকিৎসা হল পড়তে শুরু করা। পড়তে পড়তে পড়ার মধ্যে স্বাদ অনুভব হতে শুরু করবে, তারপরই পড়ার আগ্রহ হতে শুরু হবে। যদি কেউ বলে, আমার তো পড়তে ইচ্ছেই করে না, চিকিৎসা দেয়া হল পড়তে শুরু করা, রোগ যা চিকিৎসাও দেয়া হল তাই দিয়ে! তাহলে শুনুন, পড়ার ইচ্ছে তৈরি করার জন্য এ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনার শরীরে অলসতা বাসা বেঁধেছে, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, এর একমাত্র চিকিৎসা হল হাঁটতে শুরু করে দেয়া। হাঁটতে শুরু করুন, সব ম্যাজমেজে ভাব কেটে যাবে। পড়ার ইচ্ছে ও আগ্রহ তৈরি করার ব্যাপারটিও অনুরূপ। তবে হ্যাঁ যদি এরকম হয় যে, একটা বিষয় পড়তে পড়তে ত্যক্ততা এসে গেছে, আর তা পড়তে ইচ্ছে করছে না, তাহলে বিষয় পাল্টে নিন, অন্য একটা বিষয় পড়ুন তাতে আর ত্যক্ততা বোধ হবে না। "কীমাতুয যামানি ইন্দাল উলামা" কিতাবে হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ঘটনা এরূপ লেখা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাব পাশে রাখতেন, এক শাস্ত্রের কিতাব পড়ে ত্যক্ততা বোধ হলে অন্য এক শাস্ত্রের কিতাব নিয়ে বসতেন।(যদি জীবন গরতে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন হাফিঃ)

কিতাব বুঝি না- এ রোগের চিকিৎসা

অনেক ছাত্র এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে যে, বুঝি না। অথচ না বুঝার দুর্বলতা কেটে ওঠা তেমন কঠিন কিছু নয়, সহজ। নিয়ম হল পণ করতে হবে আজ এক শব্দ হলেও বুঝব। আর এক শব্দ বুঝা অবশ্যই কঠিন কিছু নয়। তারপরের দিন দুই শব্দ বুঝব, তারপরের দিন তিন শব্দ। এভাবে বাড়াতে থাকলে অতি সহজেই বুঝের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। তারপর একবাক্য, দু বাক্য, তিন বাক্য, তারপর এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা, তিন পৃষ্ঠা- এভাবে বুঝের পরিমাণ

সহজেই বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বুঝার ব্যাপারে অলসতাকে স্থান দেয় এভাবে যে, আজ কিছুই বুঝল না, অথচ তাতে কোনো পেরেশানী বোধ করল না। পরদিনও কিছুই বুঝল না, তাতেও কোনো পেরেশানী বোধ করল না, তাহলে এভাবে একসময় তার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে, অতি সহজ কোন বিষয়ও সে বুঝবে না। না বুঝা রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল বুঝতে চেষ্টা করতে থাকা এবং ধীরে ধীরে এই চেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকা।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, অনেক ছাত্রের আরবী কিতাবপত্র না বুঝার পেছনে নাহু সরফের দুর্বলতা একটা বিশেষ কারণ। যদি নাহু সরফে দুর্বলতা থাকে তাহলে কোনোক্রমেই সে ভাল করে আরবী কিতাবপত্র বুঝতে সক্ষম হবে না। এরূপ ছাত্রের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অল্পদিনেই এ দুর্বলতা কেটে ওঠা সম্ভব। সরফের জন্য মীযান-মুনশায়িব ও ইলমুস সারফ (বা ইলমুস সীগা) আর নাহুর জন্য নাহবে মীর কিংবা পারলে হেদায়াতুন্নাহু- এ কয়টি কিতাব জবত করে নিলেই ইনশাআল্লাহ আরবী কিতাবপত্র বুঝার বুনিয়াদী শক্তি গড়ে উঠবে। মাত্র তিনটি কিতাব জবত করার কষ্টটুকুও যদি কোন তালিবে স্বীকার করতে না চায়, তাহলে তার জন্য করুণা করা বৈ কোনো গত্যন্তর নেই।
(যদি জীবন গরতে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন হাফিঃ)

বর্তমান সময়েও মুসা (আ:) এর মত ইলমের পিপাসা থাকা:

ইলম বা জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ ইসলামের অন্যতম বড় গুণ। নবীগণ ছিলেন জ্ঞান অন্বেষণের সর্বোচ্চ উদাহরণ। বিশেষ করে হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই, তিনি ছিলেন ইলমের এক তীব্র অনুসন্ধানকারী। তাঁর এই গুণ মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। আজকের যুগেও সেই গুণ ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কুরআনি দৃষ্টিকোণ:

সূরা কাহফ (আয়াত ৬০-৮২)-এ মূসা (আঃ) ও খিজর (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
মূসা (আঃ) যখন ভেবেছিলেন যে, তিনিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে খিজর (আঃ)-এর কাছে পাঠান। খিজর (আঃ) এমন কিছু ইলমের অধিকারী ছিলেন, যা মূসা (আঃ)-এর জানা ছিল না।

মূসা (আঃ) বলেছিলেন:

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
"মূসা বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গে চলতে পারি, যাতে আপনি আমাকে সেই জ্ঞান শেখান, যা আপনাকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?"
— (সূরা কাহফ: ৬৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, একজন রাসূল হয়েও তিনি আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য বিনয় সহকারে একজন আল্লাহপ্রদত্ত ইলমের অধিকারীর কাছে শিষ্য হতে রাজি হয়েছেন।

মূল শিক্ষা:

১. ইলম চাওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত – নবীর মতো:

মূসা (আঃ)-এর এই ঘটনা প্রমাণ করে, ইলম অর্জন এমন এক আমল যা নবীগণও ছাড়েননি। সুতরাং আমাদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত।

২. বিনয়ের সাথে শেখা:

মূসা (আঃ) বিনয়ের সাথে অনুমতি চেয়েছেন — “আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?”। জ্ঞান অর্জনে অহংকার নয়, নম্রতা দরকার।

৩. দুরূহ যাত্রাও স্বীকার করা:

ইলমের জন্য মূসা (আঃ) দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। আজকের যুগে ওলামায়ে কেরাম, কিতাব ইন্টারনেট সহজলভ্য—তবুও আমাদের আগ্রহ কম। অথচ ইলমের তৃষ্ণা থাকলে যেকোনো কষ্টকেই সহজ মনে হবে।

বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তা:

১. জাহেলিয়াত ও বিভ্রান্তি বেড়ে গেছে।
অনলাইন, মিডিয়া, সমাজে নানা ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। এগুলো থেকে বাঁচতে হলে সঠিক ইলম জরুরি।

2. সঠিক দ্বীন বোঝার জন্য ইলম দরকার।
নামায, রোযা, হালাল-হারাম, পরিবার, ব্যবসা—সবকিছুই সঠিকভাবে করতে হলে দ্বীনি জ্ঞান চাই।

3. দাওয়াত ও সংশোধনের জন্য ইলম প্রয়োজন।
নিজে জানলে তবেই অন্যকে শেখানো সম্ভব।

উপসংহার:

হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন একজন উলুল-'আযম নবী, তবুও তিনি ইলমের জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জ্ঞান অন্বেষণ এর জন্য সফর করেছেন। সুতরাং আমাদের—সাধারণ মানুষের—জন্য আরও বেশি ইলম অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। বর্তমানে সময়েও যদি তাঁর মতো ইলমের পিপাসা থাকে, তবে আল্লাহর রহমত ও হেদায়াতের দরজাগুলো খুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমল বিন মা'রুফ ও নাহিয়ানিল মুনকার তথা দাওয়াত ও তাবলীগ

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্তসমূহ নিম্নরুপঃ

* আল্লাহ্ কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

* আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহ্র হাম্দ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজের মজলিসে সকলের সম্মিলিতভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে, তাই এটা পরিত্যজ্য।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরূরী।

* নরমীর সাথে কলা বলা, কঠোরতা পরিহার করা। মোস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সাথে বলা, আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।
* এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ-নছীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ রেখে কথা বলা জরুরি।

* তারগীব (উৎসাহমূলক কথা), তারহীব (ভয় ও সতর্কতামূলক কথা, ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাথে ইসলামের মু'আমালাত, মুআ'শারাত এবং আখলাক-চরিত্র সম্পর্কেও বয়ান রাখা জরুরি।

* শ্রোতাদের মন-মেজায লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরি।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি।

* দাওয়াত ও নছীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীগণের সুন্নাত।

* শ্রোতাদের খায়ের খাহীর জ্যা নিয়ে দাওয়াত দিবে ও বয়ান করবে।

* পরকালমুখী করে বয়ান করা অর্থাৎ, মুখ্যত আল্লাহ্ হুকুম ও দ্বীন মানা না মানার পরকালীন লাভ ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌণভাবে উল্লেখ করা যায়। যায়।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেয়া, যাতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

* দোষ-ক্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা, যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করব না? আমরা এই পাপ পরিত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই পাপ পরিহার করুন ইত্যাদি।

* দায়ী (দাওয়াত দানকারী) নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে। এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে সে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে।—(যদি জীবন গরতে চান - মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন হাফিঃ)

প্রতিটি আমল এর প্রতি গুরুতারপ করা

একজন মুমিন বেক্তি দৈনন্দিন বিভিন্ন আমল এর মাদ্ধমে তার জীবনটাকে সাজিয়ে থাকে। যেমনঃ নামাজ,কুরআন তিলাওয়াত,যাকাত, সিয়াম, জিকির-আযকার ইত্যাদি।

একজন তালিবে-ইলমকে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি প্রতিটা আমল এর এহতিমাম জরুরি। বিশেষ করে;

সালাতের ইহতিমামঃ

সালাতের মধ্যে তেলাওয়াতের ইহতিমাম করা। প্রতিটা অর্থ জেনে পড়া , সালাতের পর কিছুক্ষণ জিকির আজকার করা। তিন কুল পাঠ করা তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবির পাঠ করা। সালাতের সময় মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করা, অন্য দিকে মনোযোগ চলে গেলে সেটাকে ঘুরিয়ে সালাতের দিকে নিয়ে আসা। এর অন্যতম একটা কারণ হলো-নামাজের মধ্যে আমাদের চোখ স্থির থাকে না।

কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমামঃ

(১) নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা,

(২) কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা, কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ বোঝার জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করা।

(৩) কুরআনকে নিজের জীবনে আমলের মধ্যে নিয়ে আসা।

(৪) কুরআন তেলাওয়াতের সময় আদব রক্ষা করা

যেমনঃ কুরআনকে উঁচু স্থানে রেখে পড়া

তেলাওয়াতের সময় ঘন ঘন না ওঠা, হাসি তামাশা না করা, কথা না বলা, একনিষ্ঠ ভাবে কুরআন
তেলাওয়াত করা।

প্রতিটা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ

গুনাহ থেকে বেঁচে এটি অনেক উঁচু মর্তবার কাজ। যা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা নেককার-সলেহ বান্দারাই পারে। পূর্বে যুগের থেকে বর্তমান সময়ে গুনাহের সরঞ্জাম, সময়, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি নানান উপকরণে পৃথিবী যেন আজ ভরপুর হয়ে আছে। একজন তালিবে ইলকে সেইদিকে খুব সচেতন হতে হবে তার যেন কোন প্রকার গুনাগ হয়ে না যায়। এমনকি অহেতুক যেকোনো কাজ(যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাত কোন কাজেই আসেনা) থেকে বেঁচে থেকার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গুনাহ হয়েই যায় তাহলে দ্রুত আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসা। যেমন, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে এরশাদ করেন,

وَالَّذِيۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً اَوۡ ظَلَمُوۡۤا اَنۡفُسَہُمۡ ذَکَرُوا اللّٰہَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِہِمۡ ۪ وَمَنۡ یَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰہُ ۪۟ وَلَمۡ یُصِرُّوۡا عَلٰی مَا فَعَلُوۡا وَہُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ ﴿

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনওভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আর আল্লাহ ছাড়া আর কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না।— (আলে ইমরান - ১৩৫)

এই আয়াত থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার মাহাত্ম্য। আর আমাদের কোন পাপ হয়ে গেলে দ্রুত তার দিকেই ফিরে যাওয়া। কেননা, তিনি ছাড়া কে আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন?

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন আমিন।